ময়না
বা
পাগলের প্রলাপ

মহর্ষি মনোমোহন

আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ময়না বা পাগলের প্রলাপ
প্রথম প্রকাশ
শ্রীমতী সৌদামিনী দত্ত
আনন্দ আশ্রম, সাতমোড়া, কুমিল্লা

দ্বিতীয় প্রকাশ কাল
শ্রী সুধীর চন্দ্র দত্ত
আনন্দ আশ্রম, সাতমোড়া, কুমিল্লা
মাঘ পঞ্চমী ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

তৃতীয় মুদ্রণ
শ্রী বিল্বভূষণ দত্ত
আনন্দ আশ্রম, সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০ মাঘ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

চতুর্থ মুদ্রণ
শ্রী বিল্বভূষণ দত্ত
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক : শ্রী বিল্বভূষণ দত্ত

শব্দ অলংকরণ ও মুদ্রণে :
জয় কম্পিউটার (ফনি ভূষণ দেবনাথ)
২৬২/ক, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ০১৭৫৭-০৮৮৫৪৩, ০১৯৪৩-৪২৭৪৯০
E-mail : joy95fani@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা : একহাজার পাঁচশত
মূল্য : একশত টাকা মাত্র

MAYNA BA PAGALER PRALAP (Some Essays) By Monomohon Datta, Published by Sree Bilwa Bhushan Dutta, Ananda Ashram, Satmora, Brahmanbaria. Price : One Hundred Taka only.
E-mail : Anandaashram2016@gmail.com

ভূমিকা

আমি কি ?–আমি মানুষ নহি, মনুষ্যত্ব আমাতে নাই,–মানুষের যা আছে, আমার তা নাই ; –লজ্জা বল, ঘৃণা বল, মান বল, মর্যাদা বল, যাহা মানুষকে মনুষ্যত্ব দেয়, সেগুলি আমায় বিমুখ ; শতমুখী বাসনা গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে, ... তবে এখন আমি কি ? –আমি অমানুষ ... বলিতে সাধারণতঃ ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে বুঝায় ; তবে কি আমি তাই ? – না তাও নয় ; যেহেতু অদ্যও আমি স্থূলদেহধারী। কি দুর্দ্দশা ! আমি কি, আমি কে, এ সংসারের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, তাহা অদ্য পর্যন্ত্যও নির্দ্ধারিত হইল না ; ... এখন আমি আমাকে কি বলিব ?

যাক্ সে কথা। মনের ভাব সম্যক্ প্রকাশ করিতে গেলে, লোকে পাগল বলে ; বিশেষতঃ হৃদয়ের অন্তঃস্থলের কথাগুলি সংসারী জীবনের পক্ষে বাস্তবিকই প্রলাপ, অসম্বন্ধ শব্দবিন্যাস এবং অর্থরহিত কবিতাস্তূপ–পাগলেরই কথা ! জানি এগুলি কাহারও ভাল লাগিবে না, যেহেতু ইহা নূতন ; –প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা ইহাতে নাই। আছে কি ? – কেবল নীরস, নীরস, প্রাণের কথা মাত্র, – সে কথা বুঝিবার লোক পৃথিবীতে অতি বিরল; ... বুঝে সে, ... যে আমার মত দুঃখের দাবদাহে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে। কি দুঃখ কেমন করিয়া বলিব ? বুঝে সে, ... যে আমার মত প্রাণের বেদনায় অস্থির হইতেছে। কি বেদনা, –ভগবান জানেন। বুঝে সে–যার আমার মত হৃদয়ের আঘাতে জীবনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে, বুঝিয়াছে সংসার ছায়াবাজী, মায়া প্রহেলিকা মাত্র। কি আঘাত, কি প্রহেলিকা অবতরণ করিয়া দেখুন... অর্দ্ধস্ফুট বাক্যগুলির অর্থ আপনা হইতে হৃদয়ে আসিবে ও বুঝিতে পারিবেন, অথবা সে কথাগুলিতে পরাণের কবাট খুলিয়া দিয়া বুঝাইয়া দিবে।

যাক্ সে কথা, বুঝিবার কাজ নাই। ভাল বলুন, মন্দ বলুন, কেহ বুঝুন আর না-ই বুঝুন, আমার কথা আমি বলিয়া যাইব, তা'য় বাধা কি ? – কেমন, তায় বাধা কি ? তবে, পাগল বলিবেন ? বেশ্‌ত, আমিও ত তাই চাই। কি চাই ?– না, আমি পাগল হই, আমার মত পাগলে জগৎ পূর্ণ হউক। আপনারা পাঠক ও দর্শক মহোদয়গণ ! আপনারা আপনাদের হৃদ্‌গত ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকুন, যা' বলিবার আছে বলে নেই, কেহ অনুগ্রহ প্রকাশের কর্ণপাত করেন তো, সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় মিশিয়া মিশিয়া সংসারের একটানা স্রোতের প্রতিকুলে আসিবেন, আর না শুনেন তো, যেমন আছেন তেমনই থাকিবেন। এখন আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন ; – আমি কিন্তু বক্তব্য বিষয়ে অবতরণ করিলাম। ... নিরাশ হইবেন না, ... চলিয়া গেলেও প্রত্যেক পংক্তিতে পংক্তিতে, অক্ষরে অক্ষরে আমাকে দেখিতে পাইবেন, যেহেতু স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ আমি মাত্রারূপে গাঁথা রহিলাম।

জনৈক মানুষ নামধেয় অমানুষ
মনোমোহন দত্ত

নিবেদন

দয়াময়ের বিশেষ অনুগ্রহে চট্টগ্রাম শাখার মলয়াবাণী বিতানের বিশেষ আগ্রহে ও অর্থ সাহায্যে "ময়না বা পাগলের প্রলাপ'' গ্রন্থখানা পুনঃ প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছি।

মলয়াবাণী বিতান চট্টগ্রাম শাখার সভ্যগণ গ্রন্থখানির ব্যয়ভার বহন করিয়া নামের সেবার বিশেষ আনুকুল্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

দয়াময়ের বিশেষ অনুগ্রহ এই সভ্যগণের জীবনে লাভ হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

পুস্তকের ভ্রম ত্রুটির জন্য আমি দায়ী।

ইতি
বিনীত নিবেদক
শ্রী সুধীর চন্দ্র দত্ত

চতুর্থ মুদ্রণ প্রসঙ্গ

মনোমোহন সাধু সর্ব সাধারণ্যে 'মলয়া' গানের ভাণ্ডারী হিসাবেই সমধিক পরিচিত। মলয়া'র ভাব রসে আপ্লুত ভাবুক পাঠক-কুল, ভক্ত-অনুরাগী, সর্বোপরি বিদগ্ধ বিদ্বৎ-সমাজ মনোমোহনকে সেভাবেই দেখে আসছেন। মনোমোহন মরমী সাধক, কবি, দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞ এবং সমন্বয়বাদী ধারার অন্যতম ধারক হিসাবেও পরিচিত। কিন্তু তিনি যে সুগভীর তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা, আত্মোপলব্ধিজাত চিন্তা অসাধারণ ছন্দময় গদ্যে সহজ সরলভাবে লিখে রেখে গেছেন– সে কথা অনেকেই আমরা জানি না। 'ময়না বা পাগলের প্রলাপ' মনোমোহন দত্ত-এর একটি গদ্য গ্রন্থ। মোট পঁচিশটি মননশীল প্রবন্ধ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে সাবলীলভাবে রচিত। মনোমোহন ভাষার কারিগরও বটে। একটার পর একটা শব্দ বসিয়ে অতি জটিল বিষয়কে সহজ করে তুলেছেন তিনি। তাঁর গদ্য গুণে সাধারণ পাঠকও এ গ্রন্থ থেকে রসোপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি মনোমোহন-এর উত্তরসূরি এ জন্য গর্বিত। কিন্তু আমি তাঁর ধর্ম জীবনের কিছুই লাভ করতে পারিনি–এ আমার ব্যর্থতা। তবে আমি হাল ছাড়িনি। মনোমোহনকে আঁকড়ে আছি ; যদি একদিন পথের দিশা পাই।

ভক্ত-শিষ্যদের আগ্রহে অনেকদিন পর এ গ্রন্থের চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হলো। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি আশা করি পাঠক সমাজে আদৃত হবে। বানান রীতিতে কোনো হের ফের করা হয়নি। বইটির প্রকাশনা তত্ত্বাবধান এবং প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন আনন্দ আশ্রম ভক্ত ড. সুকুমার বিশ্বাস। বইটির নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আনন্দ দেবনাথ, অলোকা দত্ত, জয়দেব বর্মন এবং চুনীলাল সাহা। দয়াময় তাদের মঙ্গল করবেন।

আন্তরিক যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থে কিছু ভুল ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। জয় দয়াময়।

বিল্বভূষণ দত্ত
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া

১০ মাঘ
১৪২৩ বঙ্গাব্দ

সূচিপত্র

আনন্দ বাজারে যাবি আয় না,
পথ দেখায়ে নিয়ে যাবে
(পাগল আমার) ময়না।

পাগলের বাণী

১
এক যে মানুষ, এক যে কথা, এক যে মজার দেশ।
চাঁদ কি সুরুয যাইতে নারে, জ্যোছ্না ফুটায় বেশ ॥
মন থাকে না, মানুষ থাকে, দেখে অন্ধ আঁখি।
যে দেখেছে সে বলেছে, এক বিনা সব ফাঁকি ॥

২
ডিগ্‌বাজী খায় রাজা, উজীর তর্কপঞ্চানন।
লাখে লাখে ভেসে যায় রত্ন সিংহাসন ॥
গাছে মাছে কথা কয়, বিদ্যা বিশারদ।
বোটা ছাড়া ফুটে থাকে, ফুল্ল-কোকনদ ॥

৩
জাগ্রত জীবন্ত সবে, কারো নাহি ঘুম।
হুজুক বুজ্‌রুক নাই, নাহি ধামধুম্ ॥
ফাঁকা বাঁকা হাসি নাই, রাকা পূর্ণ শশী।
প্রাণে প্রাণে মাখামাখি, অফুরন্ত হাসি ॥
মন ছাড়া মানুষের কথা যেবা শুনে।
অবাক্ হ'য়ে বসে থাকে, হাত দিয়া কাণে ॥
অদ্ভুত সন্ন্যাসী স্বপ্ন, লিখিতেছে মনো।
ঘরে বস, দেখতে পাবে, ছাড় ওনো দোনো ॥

পাগলের গান

সাজিছে কাল মেঘ, মরা গাঙে ছুটিছে বান।
তনু-তরী ভাসা'য়ে দে, তটিনী বেয়ে উজান।
ছল্ ছল্ ছল্ ছল চোখে
কুল্ কুল্ কুল্ কুল্ ডাকে,
কুল নিবি আয় তোরা কে, চল্ চল্ চল্ চল্ গেয়ে গান।
খল্ খল্ খল্ খল্ হাসি,
আয় যাবি আয় বাজায় বাঁশী,
দেখে আসি, আমরাও হাসি, যে হাসির আর নাই ফুরান ॥
ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ হালে,
মনো ডাকে আয় যাই কুলে,
ঝপ্ ঝপ্ ঝাঁপ্ দেই অকুলে সপ্ সপ্ করে মারি টান।
সর্ সর্ সর্ সর্ স্বনে,
তর্ তর্ তর্ তর্ গানে
কুল্ কুল্ কুল্ কুল্ তানে, লাগবে, কুলে তরীখান।



আমার কথা

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্'

আমি কি ? আমি একজন মানুষ, কিন্তু মনুষ্যত্ব আমাতে নাই। – মনুষ্যত্ব লভিতে হইলে, বাহ্য শোভা চাই, ভণ্ডামি চাই, কার্য্যে ও কথায় বিভিন্ন চাই, আস্ফালন আন্দোলন চাই, অহঙ্কার চাই ; – কিন্তু আমি তা পারি না, – পারি না বলিয়াই মানুষ নই, মনুষ্যত্ব আমাতে নাই, – আমি অপ্রকৃতিস্থ পাগল ; – কিন্তু যাহারা মানুষ নামধেয়, তাহাদেরও ত প্রকৃতির স্থিতি দেখিতে পাই না, –সংসারই অপ্রকৃতিস্থ ; তাই বুঝি আপনা হইতে বিভিন্ন গুণাবলী বুঝিতে অক্ষম, এবং তাই বলিয়াই আমি পাগল।

আমি জানি সংসার–ছায়াবাজী, জগত–মোহময় মায়া প্রহেলিকা ; একা আসিয়াছি, একা যাইব, সঙ্গে কেহই যাইবে না। আমি বুঝিয়াছি শত্রু মিত্র উভয়েরই আবশ্যকতা আছে, শুধু মিত্রের প্রয়োজনীয়তা নাই ; তাই ব'লে আমি এবং আমার মত লোকগুলি মানুষ নহে, মানুষ নামধেয় জীবেরা আমায় মানুষ বলিতে ঘৃণা করে, – কি করিব ?

আমি বনফুল, বনে আমার জন্ম, বনেই আমি ফুটিয়াছি, বনেই অবস্থান করিতেছি ; –কেহ আমায় মানুষ না বলুক ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার ঐকান্তিক কামনা, হৃদ্গত একমাত্র বাসনা, যেন বনেই আমার লয় হয়, শান্তিময়ী বনদেবীর কোলেই যেন শেষ শয্যা পতিত হয়, যেখানকার অণুপরমাণুতে আকৃতির গঠন সেখানেই যেন মিশিয়া যায়।

সংসারে এত লোক, এত ধনী, এত মানী, এত দরিদ্র, এত মূর্খ, এত জ্ঞানী, এত সুখী, এত দুঃখী, এত ছোট, এত বড়, তাহারা সকলই মানুষ, কিন্তু আমি তা নই। আমি কি ? আমি অন্য কোন জীব নহি, তবে মানুষের মত মানুষ হইতে পারি নাই, তাই পাগল। কেন পাগল ? না,–বুঝিয়াছি নীরব কার্য্য এখানে পণ্ডশ্রম মাত্র ; যে স্ফীতবক্ষে আপনার ক্ষমতা-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে পারে সে-ই জগতে চলশক্তি সম্পন্ন, আর যে নীরব–সে মৃত।

আমি বড় একটা হাসি না। কেন হাসি না ? হাসিবার বিষয় কি আছে, যে হাসিব ? কেহ হাসে কাহাকে বিরক্ত করিবার জন্য, কেহ হাসে স্বার্থপরতার দায়ে অন্যের মনস্তুষ্টির জন্য, এবম্বিধ হাসি আমি ভালবাসি না, ভাল লাগে না,

– তাই হাসি না। হাসি কি ? মনের কোন এক অতি উচ্চ অবস্থায় প্রকৃত হাস্যের উৎপত্তি। অর্থসংযুক্ত বদনের ভঙ্গীমাত্রই হাসি নয় ; প্রকৃত হাসি আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে উছলিয়া, হৃদয়-মন হাসাইয়া শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হয়, সে হাসি কৈ ? – সে হাসির মর্ম্ম আমি বুঝি, কিন্তু হাসিতে পারি না বলিয়া নীরব থাকি, তাই আমি মানুষ-সমাজের বাহিরে–তাই আমি মানুষ নহি, মনুষ্যত্ব আমাতে নাই, – আমি অপদার্থ, পাগল !!!

নিঃস্বার্থপরতাই এ সংসারে পাগলামী, তাই আমার মত লোকগুলা পাগল ও তাদের কাছে অপদার্থ। সকলেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে কিন্তু আমার তা নাই। মানুষ স্বার্থপর, স্বার্থপরতার বীজ তাহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে, প্রতি রোমকুপে, অণুপরমাণুতে অঙ্কিত, নিঃস্বার্থপরতা তাহাদের বুদ্ধির অতীত বিষয়, –তাই আমি– ... ! আমি অপদার্থ !!

হাঁ, তা বলেই কি, – কি শিশু, কি বালক, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ–কেহ আমাকে দেখিতে পারে না ; আমাকে দেখিলেই তাহাদের ঈর্ষাবৃত্তিগুলি আপনাআপনিই উছলিয়া উঠে ; ... ... আমায় দেখিলে প্রকৃতিরদয়িত-তনয় ক্ষুদ্র শিশুর অধর প্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে, সে হাত পা নাড়িয়া কত ব্যঙ্গই না করে ; – আমায় দেখিলে চঞ্চল বালক কত হাবভাবই না প্রকাশ করে, তাহার চঞ্চলতা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া আমার পানে ধাইয়া আসে ; – আমায় দেখিলে যুবার হৃদয়ে আশার উজান বয়ে যায়, সে যেন জগত–সংসার ভুলিয়া গিয়া চিন্তা রহিত চিত্তে আমোদের উচ্চ হাস্যের তরঙ্গবহুল স্রোতে ভাসিয়া যায় ;– আমায় দেখিলে প্রৌঢ়ের অন্তরে ঘৃণার সঞ্চার হয় ; সে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, কপটতা, কত কিছু গুরুতর অভিযোগ আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে।

আমায় দেখিলে বৃদ্ধের ঈর্ষা-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, সে আমার নির্ভীকতা, মৃত্যুচিন্তারহিত প্রশস্ত হৃদয় দেখিয়া– "অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে।

জগত–প্রকৃতির বিপরীতে আমার গতি, কাজেই আমি... অপদার্থ– "পাগল"।

আমি পাগল ! – বেশ আছি। হেয় জগত প্রপঞ্চ, আমি চাহি না, ওসব বাজে কথার, অঙ্গভঙ্গী কি ভ্রূভঙ্গিতে আমি ভুলি না, সেই সকল চতুরতাকে আমি ঘৃণা করি, – তাই তাহারা আমায় উপেক্ষা করে, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে

চায়, এবং নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে–"অপদার্থ", "পাগল" আর কত কি অভিধান ছাড়া উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া দূরে সরিয়া যায়। যাক্ ক্ষতি নাই ; আমার মন বলে,

"তেরী মেরি দোস্তি লাগ্‌ল,
লোক সব বদ্‌নামী কিয়া।
লোক সব্‌কো বক্‌নে দিজে,
তোম্‌নে হাম্‌নে কাম কিয়া ॥

প্রাণ বলে, –

"উপল বরষি গরজত তরজি
ডারত কুলিশ কুঠার।
চিতব কি চাতক জলদ ত্যজি
মাঙ্গত আনকি ওর ॥

ঠান্‌দিদি কয়,

স্বামীসোহাগিনী হ'তে পার্‌লে আর কেউ ভালবাসুক, আর নাই বাসুক, ওসব ভালবাসার কাজ নাই।

লোকে আমায় পাগল বলুক, আর যাই কেন না বলুক–বেশ কথা ! আমিও মনকে বুঝাইয়াছি, –রে মন ! ভাল হওয়া বড় শক্ত কথা ; লোক-চক্ষুর ভালবাসা তুমি আকাঙ্ক্ষা করিও না, যত পার মন্দ হইয়া যাও–হ'তে পারলে দায় সারলে ; যেহেতু জমিদার পতিত জমির খাজানা নেয় না। এই রকম বুঝিতে চাই বলিয়াই আমি, –আমি কি ? – না অপদার্থ, অপ্রকৃতিস্থ পাগল !!!

পাগল ! পাগল !! পাগল !!! মনেরে কথা খু'লে বল্‌তে গেলে সংসারে সকলেই পাগল ; –মাতোয়ারা হইবার ত পাগলামী। তবে দেখ, –দিগন্তব্যাপী এক দৃষ্টি করিয়া ভাবিয়া দেখ, আমি যে পাগল ; ভাল কে ? সবাই পাগল–কেউ রূপে পাগল, কেউ ভাবে, কেহ বা ধনে পাগল, কেহ বা মানে পাগল, কেহ বা যশের জন্য ভবের হাটের মাঝখানে উলঙ্গ নাচিয়া বেড়ায় ; –সে কি পাগল নয় ? তবে তাদের পাগলামীর অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে, অভিধান আছে, ব্যাকরণ আছে, আমার তো তা' নাই ; আমি কতকটা অস্বভাবের পাগল বনিয়াছি, তাই সকলেই ভাল, – আমি এবং আমার মত দু-দশটা লোক সংসারে সমাজে উপেক্ষণীয়, ঘৃণাস্পদ অপ্রকৃতিস্থ ; – অপদার্থ–পাগল !!

এই পাগলামীই আমার সৰ্ব্বাংশে প্রার্থনীয় !!! অবধূত বলে, এইরূপ পাগলামী যথার্থই মঙ্গল ; –দয়াময়ের অপার করুণাবলে জগত পাগলে পূর্ণ হউক। –সংসারে অনুকূল প্রবাহ প্রতিকূলে ফিরিয়া গিয়া শান্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হউক।

"আর না"–

পাগল, পাগল বলিয়া তোমাদিগকেও পাগল বানাইয়া তুলিলাম ; এ পাগলের বুলি কি–ভাল মানুষ তোমরা, –তোমাদের ভাল লাগিবে ? তোমাদের ইচ্ছা তো, –সংসারে কোকিলই থাকুক, আর বসন্তের প্রভাতে শ্যামল নিবিড় নিকুঞ্জে বসিয়া, পঞ্চমে গলা চড়াইয়া বিরহিণীকে ডাকুক ; কেননা, – তার স্বর প্রাণজুড়ান মিষ্ট ; আর–কাকগুলা সবংশে ধ্বংস হইলেও ক্ষতি নাই, যেহেতু–বড় কর্কশভাষী। কিন্তু সংসারে কাকের সংখ্যাই অধিক। বোধ হয়, – লীলার সময় হরির লীলারহস্যে এদেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান, বোধ হয়–মসীবিনিন্দিত পুত্রও যেমন পিতামাতার স্নেহের দৃষ্টিতে সোনার চাঁদ, তেমনি এ সম্পূর্ণ সৃষ্টিরহস্য ও সৃষ্টিকর্তার আদরের পুতুলই হইবে। সেই ভরসায়, – তোমরা তোষো, দোষো, আর রোষো, – আপ্‌নাভাবে আপ্‌নি ভাসিয়া চলিয়াছি। কিন্তু হায় ! – হৃদয়ের ভাব, মনের কথা ভাষায় ফুটে না, প্রকৃতির স্বতঃ প্রেরণায় সুখ দুঃখের ধাক্কা লাগিয়া একটু আধটু ফুটিলেও এ ছিন্নতন্ত্রী বীণাযন্ত্র মৰ্ম্মস্পর্শী সে রাগিণীর আলাপ-চারী করিতে সম্পূর্ণই অসমর্থ ; কিন্তু তবুও প্রাণের আবেগে সে চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া এ কাঁচা হাতের তুলিকা কত জায়গায় রঙ্গে বদরঙ্গ ফলাইয়াছে ; তাই এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊনবিংশ বর্ষ যুবকের যৌবন-সুলভ চপলতার দোষ পরিহারের জন্য অমর কবির ঐ–এবং–এই–

"যদি নাহি থাকে সুর-তাল-জ্ঞান,
যদিও না থাকে রাগিণী বশে ;
তবুও কি কেউ নাহি করে গান,
আপনার ভাবে ভাসিয়ে রসে ?"

পদটী–
সাধারণকে উপহার দিয়া স্বাভাবিক, তা-না-না-না গুন্ গুন্ স্বরে–

আমায় ল'য়ে ডুব দে গো মা
হরি প্রেম সাগরের জলে।
আমি অবোধ শিশু ডুব্‌তে নারি,
ভাসা'য়ে তোলে হিল্লোলে ॥

এই পদটী–
গাহিতে গাহিতে পাগল আজ আসর হইতে সরিয়া পড়িল। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার হয়ত আসিতেও পারে ; –কে জানে ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা !

সত্যইচ্ছা ঈশ্বরের
আর যত মিছা ফের,
কাঙ্গালে পেয়েছে টের,
দেবীর কৃপায় ॥

পাগলের গীত–

পাগল, পাগল, সবাই পাগল,
আমার কেন পাগল খোটা !
দিল-দরিয়ার ডুব্ দিয়ে দেখ্
পাগল বিনে ভাল কেটা ॥
কেউবা ধনে, কেউবা মানে,
কেউবা পাগল ভাবের টানে,
কেউবা পাগল ঘরের কোণে ভে'বে মনে এইটা ঐটা ॥
কেউবা রূপে কেউবা রসে,
কেউবা পাগল ভালবেসে
কোন পাগল কাঁদে হাসে, ঐ পাগলামী বড় ঘটা ॥
সবে বলে পাগল পাগল ;
পাগলামী কি গাছেরি ফল ;
তুচ্ছ করি আসল নকল সমান সকল তিতা মিঠা ॥
যার হইছে, সে আসল পাগল,
তা'বিনে আর নকল সকল ;
কলের বেকল ঘুরছে কেবল, বেন্ধে জটা দিয়ে ফোঁটা ;
হইতে গিয়ে ঐ সে পাগল,
মনোমোহনের গে'ছে সকল,
বাকী আছে গাছের বাকল ছেলের হাতে খে'তে ইটা।
তবু যদি ভাগ্যফলে,
দয়া করে ঐ পাগলে,
ফাঁকি দিতে পারি কালে, নইলে কেবল মাথা কোটা ॥



চাই কি

আমি চাই কি ? তুমি চাও কি ? সে চায় কি ? আমরা চাই কি ? তোমরা চাও কি ? –এ অকুল ভব-সাগরে এ উত্তাল তরঙ্গ কেন ? ঘাত প্রতিঘাতে এত কলরব কেন ? এত মারামারি হুড়াহুড়ি কেন ? একে আরে এত বাদবিসম্বাদ কেন ? এত আলোচনা কেন ? – এই "কি এবং কেন" এই দুই কথার উত্তর কে দিতে পারে ?

বেদ-বাইবেল কোরান-পুরান, নিখিল শাস্ত্রগ্রন্থ, বিজ্ঞান, রসায়ন, আয়ুর্ব্বেদ গভীর গবেষণা, প্রকৃতির বিস্তৃত গ্রন্থ, অধ্যাপকের অধ্যাপনা, মনস্বীর মনন, যোগীর যোগ, তপস্বীর তপ, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস, গৃহীর গৃহবাস, মানবের জীবন-ভরা এত অধ্যাবসায় এতকাল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হার মানিয়া চলিয়াছে। –কই সে উত্তর ? কে দিবে উত্তর ? কই পাওয়া যায় সে উত্তর ? জানি অনন্ত বিশ্ব এই একটি কথার লাগি ঘোরতর তাণ্ডবে আত্মহারা হইয়া নাচিতেছে ; আবার বলি, –কই সে উত্তর ? কে দিবে উত্তর ? সসাগরা ধরার সিংহাসনাসীন রাজাধিরাজ, শুনেছি-অনন্ত ঐশ্বর্য্যের তৃপ্তি ঠেলিয়া দিয়া–ঐ– সে উত্তরখানা চায়, দীন হীন কাঙ্গাল অনশনে তৃণশয্যায় কেবল ঐ উত্তরখানার দিকে তাকাইয়া যাকে।

তোমরা যদি কেউ জান, – বল ; আমি কান পাতিয়া রহিয়াছি, –আর সকলে উপেক্ষা করুক, –শ্রবণ ভ'রে আমি শুনিব। কই ? –চাঁদও বলে না, রবিও হেসে হেসে চলে যায়, তারাও মিটি মিটি চায় পাখীগুলিও উড়ে উড়ে চলে যায়, গাছের পাতাগুলি তা-না-না-না করিয়া নড়েচড়ে, ফুলটী সে কথা বলিতে যাইয়া আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, আর বলিতে পারে না ; নদীর জল কেবল ঢেউ খেলে, পাহাড় কেবল উঁকি মারিয়া হাবার মত চেয়ে থাকে, শিশু সে কথার লাগি মায়ের আঁচল ছাড়ে না, রমণী স্বামীসোহাগিনী হ'তে চায়, কেউবা ঘোম্টার আড়াল হ'তে চুপি চুপি উঁকি দিয়া একে-আরে খুঁজিয়া বেড়ায়, রোগী কেবল আর্তনাদ করে, ধনী কেবল অহঙ্কারের বড়াই মারে, মা কোলের শিশু কোল হইতে নামাইতে চায় না, ফিরে ফিরে নাকে মুখে চুমু খায় ; কি বুঝে শিশু স্তনের বাট মুখে লইয়া কখন হাসে কখন

কাঁদে, আবার ঘুমের ঘোরে লুটে পড়ে ; ছেলেরা ধামাল খেলায়, যুবকেরা বাবুয়ানার বাহার মারে, প্রৌঢ় হাপে ধাপে মাত্ করিয়া আপনি আপন বড় হতে' চায়, বৃদ্ধ জীবনটা ভুল করিয়া বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোরুক্ টানিয়া আপ্‌সোস মিটায়। সে কথা কি ? – কি চায় ? –এত কেন ? হায় ! হায় ! হায় ! এ ছোটখাট কথা দু'টির উত্তর অভিধান ব্যাকরণে কি নাই ? সাহিত্যের এত বড় কলেবরে কি নাই ? বোধ করি নাই। তা' হ'লে বিদ্যাবাগীশের কচ্‌কচি থামিয়া যাইত, বুদ্ধিমান বুদ্ধি হারাইত, তার্কিক স্তব্ধ হইত। কই ? গোল্‌ত থামে না ! – মূল পেলে কি আর গোল থাকে ? মূল বুঝি মিলে না। কি মূল্যে সে মূল মিলে ? জহরীর হিসাবে দাম কত টাকা ? সংখ্যার বড় নয় লিখিয়া ডান দিকে অনন্তকাল কেবল শূন্য বসাইয়া দাও, – এত টাকা মূল্যে কি সে মূল মিলে ? যদি মিলিত, তবে–আমি না পাই, তুমি না পাও, সে না পায়, –মুকুটধারী পাইত। না, না, না, তার রাজকোষে কোথায় এত অর্থ, যে মূল্যে সে মূল বিকায়।

পাগল কয়, ঐ নিশীথ কালের স্তব্ধ রাগিণীতে, ঐ দুপুর বেলার ধূ হাওয়াতে কয়, প্রভাতের ভৈরবী নিক্কণে সন্ধ্যার পূরবীতে তালে বেতালে স্পষ্ট করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কয়, ঘুমের ঝোঁকে শিশুর চোখে কয়, যুবতীর তাম্বুলরঞ্জিত ঠোটে কয়, ঐ তার হাবভাব ভঙ্গিতে কয়, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ক্ষীণকণ্ঠে কয়, ঐ পাগল তান্ ধরিয়া গেয়ে যায়, –মানুষে তারে ভালবাসে না, ঘৃণা করে, –তাই সে ঐ দূরে গেয়ে যায়, মাঝি তরণীতে পাল খাটাইয়া অবসাদে আনন্দে ঐ রাগিনী চাপিয়া চাপিয়া ধরে, কখন বা ভাটীয়াল ভাটী গাঙ্গের উজান ঢেউয়ে চেঁচাইয়া কয়, ঐ বায়ু কোণে ঝাঁ, ঝাঁ করিয়া ঘর ভাঙ্গিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া ত্রাহি রবে কয়ে যায়, ঐ শিশু বৎস হাম্বা রবে ডেকে কয়, গাভী বাছুরের গা চাটিতে চাটিতে হাই তুলিয়া কয়, ঐ দুর্ব্বল ক্লিন্ন শীর্ণ গলটা ঝিক্ চাড়া খুঁজিতে খুঁজিতে বকাবকি করিয়া কয়। –আরে কি কয় ? কে জানে, কি কয় ? আমি কি জানি ? যদি কেউ ঘাতে প্রতিঘাতে আত্মহারা হইয়া সে কথা শুনিতে আকুল মনে, আকুল নয়নে তাকাইয়া থাকে, তবে সে তারে এ তারে তারহীন টেলিগ্রামে টকাট্‌ক ঠকাঠক তারের তান বাজিয়া সে গানের সুর প্রাণে লাগাইয়া যায়। সে কি ? কি চাও ? কি চাই ? এত কেন ? এ শব্দাড়ম্বরের পরিসমাপ্তি কই ? – কি ? উত্তর নাই ; এত কথা বলিতে পার ? এত বিদ্যা পেটের ভিতর, হাকে ডাকে গরম

ক'রে, এ বাসরে সঙ্ সেজে, ভেঙ্গে গড়ে এত হইতেছ ; কিন্তু একথাটী কি? উত্তর নাই। ভাবিয়া দেখিলে না, শুনিয়া শুনিলে না, বুঝিয়া বুঝিলে না, কেবল ধামালে বে-সামাল বে-সামাল ! বায়া ছিড়িয়া গেল, ডাহিনা বাজে না, তন্ত্রী সুর ছাড়িয়া দিল, তবু আমার ঐ কথার উত্তর হইল না। এ জগত প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে একটি সঙ্-এর পুতুল–কেবল দোল খেলায়, আর ঘুরে মরে। হায় ! হায় ! হায় ! কার কাছে যাব, কোথা তা'রে পাব। এ গানের তানে যে প্রাণে প্রাণে আসমানে চড়িয়াছে, –কই সে মানুষ ! তোমরাত সবাই মানুষ : – তোমরা এত মানুষ, তবু তালাস কর্‌তে হ'ল আমার মানুষ। তোমাদের ভারী বিরক্ত হইবার কথা। আরে ! ফেলে রাখ্ ওসব ভ্রূকুটি, –প্রাণের ভিতর যে ত্রুটি, মোটামুটি সেইটী তালাস করে দেখ্ দেখি ! – সকল খুটী নাটি হ'তে খালাস হয়ে যাবি। বেকসুর খালাস হ'তে না পারলেও পাশ কাটিয়া যেতে পার্‌বি– যাক্ সে কথা। সে কি না জানে ; কেউ কি কিছু করে ? কারো প্রাণে কি প্রশ্ন না জাগে ? কেউ কি তার উত্তর চায়, যে চায় সে পায়। শোন ঐ পাগল গায়,

পাইতে শুধু আনন্দ, জগত ভরে এত দ্বন্দ্ব,
দীনের কাছে সে ধন বন্ধ, পায় না তারে দালান কোঠায় ;
মুনিমুক্তা যতই বল, শান্তি বিনা সব বিফল,
সব ছেড়ে দে হরি বল, শান্তি ফল পাবে তায়।
কুঁড়ে ঘর কি গাছের তলা, বাসা করে রও নিরালা,
একলা মনে নামের মালা জপ যেয়ে সর্ব্বদায়।
যে ধন পায়না জগত মূল্যে, সে ধন পাবে অবহেলে,
কয় মনোমোহন দীন কাঙ্গালে এম্‌নি ভাবে
দিন যেন যায়।

উত্তর ঃ
একটি অফুরন্ত হাসি।



প্রার্থনা

হরি !

তোমারি বিভূতি বিশ্ব তুমি নাথ ! দূর দৃশ্য,
পাপ পূণ্য, স্থূল সূক্ষ্ম, তোমাতেই সবাই ;
তুমি হে সকলি সব জগত বিভূতি তব,
প্রকটিত লীলা খেলা, বুঝিয়াছি তাই,
বুঝায়েছ তুমি (নাথ !) তোমা ছাড়া নাই ॥

হরি !

দেখা কি দিবে না ! দয়াময়, করুণ নয়নে কি দীনের পানে একটি বার ফিরে চাহিবে না ! এই নাকি তোমার ইচ্ছা ; – কেমন প্রভো ! হা নাথ ! দেখ না কি হৃদয়, দেখ না কি প্রাণ–আর দেখিবে কি, – তুমিইত এমনতর লীলাখেলা করিতেছ, অথবা করাইতেছ। বলিব কি, শুনিবে কে ? তোমারই তো লীলাখেলা, এ জগত প্রপঞ্চ, – তুমিই তো সবের সকল, সকলের সব; –না দেখিবে কেন ? না শুনিবে কেন ? তোমার অগোচর কি আছে ?... কে বুঝে তোমার এই মায়া-প্রহেলিকা, কে জানে তোমার ভাব, প্রভো ? কারে বা জানাও ! নিরদয়, বড় নিরদয় ! নৈলে এমনতর কেন ? হাসিকান্নার মধ্যে এমন বিভূতি ভাব কেন ? দারুণ সমস্যা !! তুমি সব জান– কিন্তু কিছুই যেন জান না ; তুমি সব দেখ,– কিন্তু কিছুই যেন দেখ না ; সব শুন,–কিন্তু শুনিয়াও যেন শুন না। এই যে নাথ ! তোমার একটি ভাব, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বড়ই সুন্দর, কিন্তু ভয়াবহ ও অনুতাপকর, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস শতধা উছলিয়া পড়ে, স্বীকার করি– ইহা অনুরাগ বৃদ্ধিরই পূর্ব্বকার্য্য... কিন্তু নাথ ! হৃদয়তো সে কথা মানে না, প্রাণতো শুনে না,– এ আবার তোমার কি ইচ্ছা ! ... তোমারই যাহা ভাব, তোমারই তাহা অভাব, – ইহাই বা কেমন ?... "তুমি পূর্ণ" ; জগত তোমারই ইচ্ছার প্রতিবিম্বস্বরূপ, ভাবাভাবে চলিয়া যাইতেছে বা চালা'য়ে নিতেছ, –এই তো কথা !! ... ... হা নাথ ! তবে এমন দুর্দ্দশা কেন ? প্রাণের উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের বেগ, অন্তরাত্মার

আস্ফালন, প্রবৃত্তির দারুণ তীব্র বচন, –এই সব কি ? ইহাতে কি তুমি নাই ? যদি থাক, –তবে এমন দুর্দ্দশা কেন ? তুমি যেম্‌নি রাখ, আমি তেম্‌নি থাকি, তাইতে তোমার বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না, তবে এমন কেন ? তুমি আমায় টান, –আমার হৃদয় মন প্রাণ, তোমার পানে ছুটে। যদিই ছুটিল, তবে শূন্য হইতে শূন্য মন ফিরে আসে কেন ? তুমি কি আমায় দেখা দিতে চাও না ? না চাও, তবে হৃদয়ে আশা দাও কেন ? আশাতে আশ্বাসিত কর বলেই তো হৃদয় ছুটে ! যদিই ছুটিল–নিরাশ দগ্ধ হয়ে তবে ফিরে আসে কেন ? – তুমি কি আমায় দেখা দিতে চাও না ? না চাও, তবে হৃদয়ে আশা দাও কেন ? আশাতে আশ্বাসিত কর বলেই তো হৃদয় ছুটে ! যদিই ছুটিল, তবে শূন্য হইতে শূন্য মন ফিরে আসে কেন ? তুমি কি আমায় দেখা দিতে চাও না ? না চাও, তবে হৃদয়ে আশা দাও কেন ? আশাতে আশ্বাসিত কর বলেই তো হৃদয় ছুটে ! যদিই ছুটিল-নিরাশ দগ্ধ হয়ে তবে ফিরে আসে কেন ?– তবে কি তুমি নাই? না তাও ত নয় ! হৃদয় সাক্ষ্য দেয় আছ, প্রাণ বলে আছ !! মন বলে আছ, মন বলে আছ প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ,–জগতে প্রত্যেক অণু পরমাণু ফুকারিয়া বলে আছ !! আমি কেমনে বলিব নাই ? আছ, তো কোথায় ? – জলে স্থলে, কি অন্তরীক্ষে–কোথায় তুমি ? কোথায় তোমার ঘর ? প্রভো ! কোথায় থাক ? বলিবে কি ? বল না ? তালাস করিলে ভাল না বাস, তালাস করিব না, শুনেই কেবল নীরব হ'য়ে থাকিব!!!-!!-!!-কৈ!! কিছু না !!! সাড়া শব্দটাও নাই কিন্তু যে দিকে কেন না দেখি, প্রাণ গলে, মন টলে, হৃদয় ধ্রুব হয়, ইহার হেতু কি। হে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, – কি, সর্ব্বব্যাপী ; কে বলিল ? – হৃদয় !! আচ্ছা বুঝিলাম, তুমি সর্ব্বব্যাপী !! ব'লে দাও না, প্রভো ! কিসে তোমার সত্ত্বার উপলব্ধি করিতে পারি। ঠাকুর !! তুমি তো সর্ব্বব্যাপী, আমি তো তোমার সর্ব্বের মধ্যে কোন স্থূল ব্যাপী, তুমি তো আমায় অধিকার করে ব'সে আছ, কিন্তু নাথ ! দেখিতে পাইনা কেন ? আবেগ উচ্ছ্বাস কমে না কেন ? "তুমি আমায় অধিকার করে আছ" –ভয় কি ? হায় ! তা না হ'য়ে দারুণ ভয়ে হৃদয় কাঁপে কেন ? কি দুর্দ্দশা !! হাঁ নাথ ! শান্তি কি দিবে না ? প্রভো ! দেখা কি পাব না ? ... ...!!! কি তোমার রূপ, কি তোমার

গুণ, কি তোমার নাম, জানি না, – জানাবে কি দেব ? জানিতে পাইব কি ? লোকে "দয়াময়" বলিয়া ডাকে, তা'বলে আমিও দু'একবার ডাকি। কেন ডাকি ! – না তাইতে যেন হৃদয়ের ভার কমিয়া যায়, প্রাণে শান্তি আসে। তুমি দয়াময়, তবে কি দয়াই তোমার নাম, দয়াই তোমার গুণ, দয়াই তোমার রূপ ? – আহা ! কি সুন্দর কথা !! প্রভু আমার সর্ব্বব্যাপী দয়াময় !! আমার কথা শুনে, আমার কার্য্য দেখে যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী দয়াময় !! দয়াতে ব্যাপীয়ে আছেন। তবে দয়া করিবে নাথ ! দয়াই তোমার সত্ত্বা!!-!!!-কর দেখি দয়া ! কেমন তুমি ! একবার হৃদয় ভ'রে দেখিয়ে লই, করিবে কি দয়া ? – কর না– একবার মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া অকুল আনন্দ সাগরের জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাই। দীননাথ ? তুমি নাকি দীননাথ ! দীনের পানে দয়ার নয়নে একবার চাহিবে কি ? দাওয়া আছে – যেহেতু দীন ইত (ভিখারী) দান পাইবার পাত্র, – ধনী নহে। কাজেই বলি দাওয়া আছে, দয়া করিতেই হইবে, কেমন প্রভো ! করিবে না ? কর দেখি দয়া ! দাও দেখি দেখা !!! হৃদয়ের বাসনাস্রোতে অমিয় মাধুরী উছলিয়া পড়ুক। জগৎমূর্ত্তি হৃদয়রাজ্যে আনয়নে শান্তি দাও। দয়াময়, তুমি প্রকৃতি, তুমি পুরুষ, হে জগন্ময় ! বিশ্বজনীন সত্যের ছবি হৃদয়ে-বদ্ধমূল হউক, জয় দয়াময় !!

হ'য়ে অবতীর্ণ নাথ ! বাসনা-প্রান্তরে,
দারুণ প্রাণের উচ্ছাস দাও দূর করে ;
সাম্যের নির্ম্মল ছবি উঠুক হাসিয়া, ...
বেড়াই তোমার নাম আনন্দে গাহিয়া ॥



পেছনে কে

এই বীজটী অঙ্কুর দিয়াছে, এই বীজটী এক পাতা দু'পাতা করিয়া পাঁচ পাতা মেলিয়া দিল, আজকাল করিয়া দশ দিন পরে ঐ পাঁচখানা শাখা বাহির হইল। –বলি, তার পেছনে কে ? কে ঠেলিয়া দিতেছে ? ঐ গন্ধরাজ গাছে হাজার হাজার কলি উঁকি মারিয়াছে, কাল হয়ত দেখিব কতক ফুটিয়াছে, কতকগুলি স্ফুটোন্মুখ, আবার-আবার ঐ কতকগুলি বৃন্তাগ্রভাগে উঁকি দিতেছে। –বলি, তার পেছনে কে ? অই একটি পাখীর ডিম্ব-দু'দিন পর শিশু ছানাটী, দশ দিন পর পাখা, দু'মাস পর চিত্র বিচিত্র নানাবর্ণে রঞ্জিত পালক, – কি সুন্দর শোভা ! –বলি, তার পেছনে কে ?

অই শিশুটি কখন হাসে, কখন কাঁদে, দু'বছর পর আমার বাড়ী, আমার ঘর, একে আরে মারামারি, দশ বছর পর ফুল বাবুটী, বিশ বছর পর, হায় ! হায় ! হায় ! যারা আদর করে কোলে নিত তারা দেখে ভয় পায়। –বলি, তার পেছনে কে ?

বর্ষাকালে এত জলের জোর ! সব ভাসিয়ে গেল, এত বর্ষণের জোর, মাটি কাটিয়া নিল, দুদিন পর কিছুই নাই। –বলি, তার পেছনে কে ? ঐ হাসিটীর পেছনে কে ? ঐ কান্নাটির পেছনে কে ? শিশুর সোহাগমাখা অধরের পেছনে কে ? বালস্বভাবসুলভ চপলতার পেছনে কে ? যৌবনের ফুটন্ত প্রতিভার পেছনে কে ? প্রৌঢ়ের ঘাত প্রতিঘাত জনিত গাম্ভীর্য্যের পেছনে কে? বৃদ্ধের নিরাশদগ্ধ জীবনের পেছনে কে ? হায় ! এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পেছনে কে ? সে কে ? সে কে ? কাহার মহিমায় এত ছুটাছুটি এত কলরব, এত আড়ম্বর, ভাত রান্নার হাঁড়িতে জলের ভিতর চাউলগুলা উপর্য্যুপরি নাচে, –বলি তার পেছনে কে ? ঐ বজ্রনিনাদ গম্ভীর জীমূত গর্জ্জনে কান ঝালাপালা করিয়া গেল, শিশু মায়ের আঁচল ধরিয়া কাঁপিয়া উঠিল, রোগী ভয় পাইয়া বিছানা জড়াইয়া ধরিল–বলি তার পেছনে কে ? এইমাত্র মনীবের ভ্রুকুটীতে চাকরের হৃদ্‌কম্প আবার আবার ঐ হাসি। –বলি, তার পেছনে কে ? এইমাত্র আঁধার রে'তে দরজা খুলিয়া বাহির হইবার কালে হঠাৎ হৃদ্‌কম্প–বলি, তার পেছনে কে ? তার পর চুরি করিয়া জেলে গেল, আর করিব না বলিয়া মনকে ধম্‌কাইল, আমাকে খাট

বানাইল, আবার দু'দিন পর সেই চুরি। বলি, তার পেছনে কে ? এই মাত্র যুবতী পর পুরুষের সঙ্গ লালসায় অধীরা হইয়া মন বাঁধিল, আবার ছুটিল, লজ্জা ভয় মান জলাঞ্জলি দিল। –বলি, তার পেছনে কে ? রোগী রোগ যন্ত্রণায় কুপথ্য ছাড়িল, আবার দু'দিন পর তাই খাইতে অধীর হইয়া গালে পুরিল ! বলি, তার পেছনে কে ? নেশাখোর নেশা খাইয়া বড় লজ্জা পে'ল গালি খে'ল, দুঃখ পে'ল, প্রতিজ্ঞা করে সব ছেড়ে দিল, আবার দু'দিন পরে সেই শৌণ্ডিকালয়ে। –বলি, তার পেছনে কে ? দু'দশ কথা উপদেশ শুনাইতে সকলে মজবুত কিন্তু কারো-রে যে–সে মত চল্‌তে দেখি না। –বলি, তার পেছনে কে ?

চাঁদটা আকাশের গায় ঠেলে ঠেলে তুলে দেয়, অত বড় পৃথিবীটা অনায়াসে ঘুরায়। অত বড় সূর্য্যটা একবার বাহিরে এনে দেখা'য়ে, আবার ঠেলে ঠেলে কোথায় নিয়ে লুকাইয়া রাখে। –বলি, তার পেছনে কে ? এই কথার উত্তর কে দিবে ? যে দিবে সে কই ? সন্মুখে কি ? তোদের আমার তাদের–বলি, সকলের সন্মুখে কি ? এই ছোট্ট ছোট্ট দু'টী কাজ, একটী কথা, একটী সঙ্কেত, কতটুকু যশ, কতটুকু মান। বলি–তারপর কি ? সমুখের সীমা কই? একটা অতি বড় অজানা, অচেনা, যেমন চাঁদটা, সূর্য্যটা, –কোন এক অন্ধকার গহ্বরে লুকিয়ে যায়, তেমনি একটা ঘোরতর যবনিকান্তরালে আঁধার বই ত নয় ? তার পর কি –কে জানে ! যে জানে সে ত বলে না,–বলিতে চায় না, কেবল হিজিবিজি ওতপ্রোত কথাগুলি উপহার দিয়ে চলে যায়। এ রহস্যের মীমাংসা নাই, এ উত্তেজনার কি অবসাদ নাই, এ প্রশ্নের কি উত্তর নাই ! বলি, এই আগুনটা ধা ধা করে জ্বলে উঠ্‌ল, কাছে যাওয়া যায় না, জ্বলে যেতে চায়, –আবার ক্ষণিক পরে কোথায় কিছু নাই। এই মহাজ্বলীয়মান তেজ কোন্ অন্ধকারে লুকি দিল, কোন্ মহান্ জ্যোতিতে মিশিয়া গেল ? কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা।– কি, উত্তর নাই ?

অই শুন পাগল গায় :

একের লীলা একের খেলা, হরণ পূরণ এক,
জগতজোড়া টেলাঠেলি সাম্য হ'য়ে দেখ,
আগে পাছে মাঝখানে তার ছুটাছুটি যত
তার ভিতরে আছে একজন, সে তাঁহারি মত।



মন বুঝে না কেন

রোজ রোজ মানুষগুলা মর্‌তে দেখি, পাতাগুলা ঝর্‌তে দেখি–কিন্তু মন বুঝে না কেন ? পাপের শাস্তি দেখি, পূণ্যের পুরস্কার দেখি, –কিন্তু মন বুঝে না কেন ? সর্ব্বদা অধ্যবসায়ের পরমপ্রতিভাপূর্ণ দিগন্তব্যাপী মাহাত্ম্য দেখি, শ্রমের সফলতা দেখি, কর্ম্মের পূর্ণতা দেখি– কিন্তু মন বুঝে না কেন ?

আজ গালভরা হাসি, কাল চোখভরা কান্না, বুকভরা হা-হুতাশ, আজ হয়ত সাপটিয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভেঙ্গে ফেল্‌তে চায়, কাল হয়তঃ শয্যার উপর পাশ ফিরিতে পারে না, –কিন্তু মন বুঝে না কেন ? যুবতীর যৌবন, জোয়ারের জল, যুবকের যৌবন, পূর্ণিমার চাঁদ, এই নদীভরা, খালভরা, বিলভরা জল, ছল্ ছল্ ছল্ ভরা ভরা চাহনি, এই আকাশভরা হাসি, – এই আর থাকে না। সর্ব্বদা দেখি জোয়ারের ভাটা আছে, হাসির কান্না আছে, সুখের দুঃখ আছে, শান্তির অশান্তি আছে, জন্মের মৃত্যু আছে, –কিন্তু মন বুঝে না কেন ?

সমুদ্রের বালু গ'ণে দিতে পারি, আকাশের তারা গণে দিতে পারি, পৃথিবীটা মাপ করে দিতে পারি, – কিন্তু, অত বড় পরিবর্ত্তনগুলা মন দেখে না কেন ?

এই বাতাসে ধুলা উড়িল, পাতা পড়িল, আবার ঝাঁ করিয়া সব কোথায় উড়িয়া গেল, – একটু হাওয়া পাব বলে নদীর তটে গাছের তলায় হা ক'রে তাকা'য়ে থাক্‌তে হল।– এই প্রবল তরঙ্গে ফেনরাশি উদ্‌গীরণ করিয়া নাচিয়া তরঙ্গিণী কি জানি কোথা ছুটিয়াছে, আবার এ নীরব,–বলি মন বুঝে না কেন ?

এই বিবাহ বাসরের এত আয়োজন, দু'টী কথায় রাত পোহায়ে যায়, কথাটী ফুরাতে দেয় না ; অমনি আবার অত সাধভরা বুক, আশাভরা প্রাণ কি জানি কি ভাবতে ভাবতে সকল আমোদ জলাঞ্জলি দিয়ে উদাসী হ'তে চায়, –বলি, মন বুঝে না কেন ?

এই শৈশবের সুন্দর হাসি, এই কৈশোরের ধামাল খেলা, এই যৌবনের জোর জব্বর, এই প্রৌঢ়ের হর্ষবিষাদ, এই বৃদ্ধের অসার গল্প, –হায় ! হায় ! হায় ! এত দেখে, –কিন্তু মন বুঝে না কেন ?

এই তার জমিদারী গেল, তার রাজত্ব গেল, ধনী নির্ধন হ'ল, কাঙ্গাল রাজা হ'ল, হাট ভেঙ্গে মাঠ হ'ল, জঙ্গল ভেঙ্গে মঙ্গল হ'ল, –কিন্তু মন বুঝে না কেন?

এই একটী চুম্বন, একটী আদর সম্ভাষণ, একটী প্রণয়ালিঙ্গন, দু'টী মিছে কথা, একটু শঠতা, দু'টী তর্ক, একটী দীর্ঘশ্বাস, তার পর সব মাটী, –আমারও মাটী, তোমারও মাটী, তারও মাটী,– কিন্তু মন বুঝে না কেন ?

সীমানা নিয়ে দুই ভাইয়ে বড় ঝগড়া, দু'চারঅঙ্গুলী পরিমিত স্থানের জন্য, এত ভালবাসা, আদর স্নেহ, সব জলাঞ্জলি দিয়ে একে আরে চোখে চাহিতে ঘৃণা করিতেছে। বলি হ্যারে পামর মন, – এই মাটী কার ? এই অত বড় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডটা কার ? এখানে সীমানা, ওখানে সীমানা, কত হাজার হাজার এমন ক'রে সীমানা গা'ড়ে, সীমানা অসীমানাতে মিশা'য়ে মিশিয়ে গিয়েছে–এগুলি কি ? কেবল মানবীয় একটী স্বভাব বই ত নয় ? দূরে যাক্ ছাই স্বভাব, মানুষের দল মানুষ নিয়ে থাকুক, আর অই পাগলটা ঝোঁপে ঝোঁপে কোণে বনে, একথা ওকথা বকাবকি ক'রে গেয়ে যাক্।

ইহা করব, উহা করব, এমত হব, হ'তে দেব না, করতে দেব না, কত কথা উঠাপড়া করে, কত ভাঙ্গে, কত গড়ে, কার কয়টী মনগড়া কথা পূর্ণ হ'তে কে দেখিয়াছে ? তবে কেন ? ইহা আর উহা, সঙ্কল্প আর বিকল্প, যা হ'বার তাই হবে, হ'তেছে, হয় হউক,– বলি মন বুঝে না কেন ?

এইটা কোন্ তালে নাচে, কোন্ রাগিণীতে গায়, এই তালের সম্ কই, এই রাগিণীর মূর্চ্ছনা কই, বে-লয়, –ছাড়া, খাপছাড়া, কেবল কতকগুলা হিজিবিজি সব মানুষগুলা, –কতকগুলা নাড়ি ভুঁড়ি আর কতকগুলা হিজিবিজি, বিশৃঙ্খল ভাবের তাড়নায় উন্মনস্ক-আর কিছু নয়, কেবল এইটা, ঐটা, –ইহা, উহা ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিন যায়, রাত যায়, বাতি নিবে যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, যে'তে ঐ ফুল গাছটা মরে, ফল গাছটা মরে, কোকিলটা চেঁচাইয়া উড়ে যায়; – আবার কেবল থাকে ঝিঁ ঝিঁ-পোকার ঝিঁ ঝিঁ, নিস্তব্ধ নীরব প্রকৃতি মাতাইয়া ঐ একটা ঝিঁ ঝিঁ-সংগ্রামের আদিতে একটা ঝিঁ ঝিঁ, পশ্চাতে একটা ঝিঁ ঝিঁ !– হায় ! হায় ! মন বুঝে না কেন ? কেন বুঝে না– কে বুঝিবে, কে বলিবে, কে জানে ?

ঐ শুন পাগল গায় ঃ

কর্ম্মসূত্র, – মানব পুতুলী বাঁধা তায়,
কত নাট্ট হয় অভিনীত,–
তুমি আছ নেপথ্যে, সে জানিতে না পায়,
সেই ভাবে পুতুলী ক্রিয়ান্বিত।



গালভরা হাসি

গলা ভরা হাসিটা কেউ হে'স না। –কারণ, ইহার ভিতর যেমন বর্ত্তমান সময়ে ১২৪ (ক) ধারার অপরাধে রাজকর্ম্মচারীদের দৃষ্টি, তেমনি বিধাতার বড়ই এক কুটিল কু-দৃষ্টি দেখিতে পাই। তাঁর ইচ্ছা, বুঝি, সে নিজেই একখানা ভরাপুরা, পূর্ণ ফুটন্ত হাসি লইয়া বা হাসি হইয়া থাকুক ; আর কেউ যেন তার অধিকারী হতে না পারে, –কেউ হ'লে, অম্‌নি পুলিশ ১২৪ (ক) ধারার ওয়ারেন্ট নিয়া হাজির। কেন না, আজ ফুলটি ফুটিল, অমনি তার বোঁটা ছিঁড়িতে রামা, শ্যামা, হরি, যামিনী, কামিনী কেউ না কেউ হাত বাড়াইল, না হয়তঃ ভ্রমরটা হুল ফুটাইয়া তার মধুটুকু লুটিয়া লইয়া গেল, বিকালে শুক্‌নো, কাল হয়তঃ ঝরিয়া পড়িয়া গেল, চাঁদটা হাসিবে ব'লে একটী পক্ষ ব'য়ে গেল। যে দিন পূর্ণ হাসি দিল সেই দিনই তার বুকের দাগটি পূর্ণ দেখা গেল, আর না হয়তঃ মেঘে ঢাকিল, আবার কাল অত বড় হাসিটী দিতে পাইল না, একটু তার আঁধারে ডুবিয়া গেল ; দু'চার দিন পর আধখানা ; আবার, পক্ষান্তে সবই ডুবিয়া গেল ! হাসি পূর্ণ না হ'তে ছিল ভাল, হাসি দিবে বলিয়া ঐ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিব বলিয়া কয়টা দিন কাটাইয়াছিনু সুখে–যেমন ঐ যৌবনের প্রথম ভাগে, বিবাহ করিব বলিয়া, শুয়ে শুয়ে চল্‌তে ফিরতে কত ছবি আঁকতাম মুছতাম, আর মনে মনে কর্ত্তাদের শৈথিল্য দেখিয়া কত বক্‌তাম। যে দিন সে দিন হইল, অমনি আশার টান ফুরা'য়ে গেল, কত অজানিত স্মৃতি, কত দুঃখের কথা সুখের কথা, বন্ধুর বিরহ, দিদিমার কথা জে'গে উঠে আর পূর্ণ সুখী হ'তে দিল না।

আগে দেখতাম শুন্‌তাম বিয়ের ঢোলে স্বর্গের তাল বাজে, আমার সে দিন শুন্‌লাম ঢোলে কয়, – রঙ্গ, রঙ্গ, রঙ্গ বুঝ্‌বি পরে। চম্‌কিয়া উঠিলাম ! মনকে বলিলাম, ওসব ধূয়া কথা, – কিন্তু তা নয় দু'দিন পরে দেখি, আবার সে দিনের ঢোলে কয়– "আগেতে ছিলি ভালা ; এখনে বুঝবি শ্যালা। বাপরে বাপ ! হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, প্রাণটা কেমন ক'রে উঠল মনটা উরু উরু ক'রে দেশ বিদেশে ঘুরতে লাগল। ও মা ! দু'মাস পরেই একি দেখি !

– এ যে জগতখানা আর এক রকম, গাছের পাতা আর এক রকম, নদীর জল আর এক রকম, মায়ের মুখখানা আর এর রকম – ও মা ! একি ! অত দৌড়ে সাধ ক'রে কাছে এলাম, –সুখের কাছে এগিয়ে এসেছি ব'লে ভাবলাম–দেখি দূরে ফেরে ঠেলে দিতে চায়। পাড়াপ্রতিবেশী ও কি বলে ? সে হাসি হাসি মুখশশী অম্‌নি শুকিয়ে পড়ল। কি করি ? কোথায় যাই ? শান্তি কই ? আগে ভাব্‌তাম অভিভাবক হ'তে পারলে কত আনন্দ করব, এখন দেখি সেই ভাবুকতার-অথি উপসর্গের সঙ্গে-প্র-পরা, অপ্‌ সমুদয় একত্রে জুটিয়া আমায় ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। খে'তে শু'তে কিছুতেই আর শান্তি নাই, সন্তোষ নাই, কেবল দিনের দিন হাওয়ার তাল ছুটে যে'তে লাগল, আর প্রাণটা পেছ লাগিয়ে, পেছ খাইয়ে, ভূতুম পাখী হ'য়ে পড়ল। হায় ! হায় ! হায় ! একি রহস্য !-হৃদয়ভরা কোলাহল, কেবল আগুন ধূ, ধূ, ধূ, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, মলয় হাওয়াতে আর প্রাণ মাতে না, খেয়াল টপপাতে আর নাচে না, পাখীর ডাকে আর মন উঠে না, নদীর ঢেউয়ে আর খেলে না, রমণীয় কাননে আর সুখ নাই, রমণীর ঈষৎ ভ্রূকুটিপূর্ণ হাস্যে আর প্রাণটা ঢু'মারে না। একি, হতভাগ্য ! অতঃপর সকলের যা আমারও তা–ঐ নিদাঘের শেষে কোথা হ'তে এসে ঐ একটা পাখী উড়ে উড়ে গেয়ে যায়, আর করে যায়–চৈতার বউ গো ! কথায় কথায় সেই চৈতার বউ সাজিয়া, চিতার ধূয়া দেখিতে লাগিলাম, ঘণ্টা বাজিল, শাঁক বাজিল একেবারে সব ছাই-মাঠি, ধুলি।

শুন শুন ঐ পাগল গায় :

মানবের সুখ সাধ
ঝ'ড়ে পড়ে অকস্মাৎ,
শ্মশানে সমাধি হয়, ফেটে যায় বুক।



এত কেন

মানুষগুলা এত দৌড়ায় কেন ? এত লাফায় কেন ? এত কলরব করে কেন? একে আরে চায় কেন ? দেশ ঘুরে কেন ? তাল বাজায় কেন ? গান করে কেন ?–বলি, এগুলার উদ্দেশ্য কি ?

ঐ যে প্রণয়িনীর হাসিমাখা মুখের দিকে বঙ্কিম নয়নে যুবক চাহিয়া চাহিয়া আঁখিতে আঁখিতে কি যেন কি কথার আঁচাআঁচি করিতেছে, ঐ যে সোহাগ ভরে কমনীয় কান্তি ননীর পুতুল শিশুটিকে কোলে নিয়া চুমু খাইতেছে, ঐ যে মানুষটা লাল কাপড় পরিয়া বাউল সাজিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিতেছে, ঐ যে একটা কে জানি, সে দুপুরে রোদে কি জানি কি ভে'বে গাছতলায় বসে হা ক'রে আকাশ পানে চেয়ে আছে, ঐ যে কে ছুটাছুটি ক'রে আবার কার কাছে যেতেছে, এ বাড়ীর মানুষ সে বাড়ীতে, এ পাড়ার মানুষ ও পাড়ায়, এ গ্রামের মানুষ ঐ গ্রামে, এ দেশের মানুষ ঐ দেশে, এত যে ছুটাছুটি, বলি মানুষগুলার প্রাণে চায় কি ? কি চায় সব মানুষই জানে, কিন্তু মনের কথা কেউ খুলে বলে না,–কেন, তা হ'লে লোকে পাগল কয়। তবে কতকটা সংসারের তাড়নায়, লোকের গঞ্জনায়, কি জানি কি ফাক্‌-ছাড়া তালে নাচ্‌তে যে'য়ে সাধারণের নিকট পাগল সেজেছি, তাই ব'লে আজ সব মানুষের মনের কথা খু'লে ব'লে দিব।

বল্‌তে পার–সকলের মনের কথা কেমন করে বল্‌ব। তা বল্‌বার একটা কল আবিষ্কার করেছি আমি। দূর ছাই, এডিসনের ফনোগ্রাফ, আর ঐ বেটার জাহাজ গড়া, রেল গড়া,–হ্যারে ! ওসব বাহিরের কথা, ওসব কারিগরী–সব আসলের নকল।

আমি নিক্তির কাটার প্রভাতে, সন্ধ্যায় দুপুর বেলায় ফুলের সুবাস, মলয় বাতাস, রোদের কণা, তা না না না, হাসির রেখা, প্রাণের লেখা গানের সুর, তালের সম, দৌড়ের জোর, নেশার ঘোর, অভাবের ভাব, আর ভাবের অভাব, বসে বসে কেবল ওজন করি। শেষটায় দেখলাম– মন, মন, মন ; –সব একখানা মন ; মানুষ, মানুষ, মানুষ–সব একজন মানুষ। বল হরি ! তারপর আর কি ? একতারে ব্রহ্মাণ্ডের সব খবর লয়,–তার, তার, তার, জগতজোড়া একটী তার। সে তারের টেলিগ্রামে নিঝুম নিরালায় ব'সে, টকাটক্‌ ঠকাঠক, করিয়া আঙ্গুল বাজাইলে গয়া, কাশী, মক্কা, মথুরা কত

অচেনা দেশের কথা চুপি চুপি ক'য়ে যায়, আর পাগলরে হাসায় আর কাঁদায়। সে কান্নার সুরে যখন প্রাণে ঢেউ খেলে, তখন দোলে দোলে ঘোলে মাখনে এক হ'য়ে যায়। আত্মহারা পাগল জগত চৈতন্যময় দেখে আর আপ্‌নি আপন কেবল বকে। মানুষগুলা যা আবর্জ্জনা ব'লে সম্মার্জ্জনীর আঘাতে ভাগাড়ে ফেলে দেয়, পাগল সেগুলা কুড়া'য়ে রাখে। গাছ পাগলে কয়–পচা পচ্‌লা বিষ্ঠামাটিই নাকি পরে সার হয়! তা ব'লেই তার লোকের কাছে বদ্‌নাম। থাক তোদের কোলাহল নিয়ে, সে নীরবে এখানে সেখানে ঝোপে ঝাপে ঘুরে বেড়াক্।

শোন্ শোন্ ঐ শোন্, পাগল গায় :

মানুষে যা মন্দ বলে — তাই আমার কর্তব্য করণ,
ভালোর দিকে যেয়ে দেখ্‌ছি — স্মরণ হয় না জন্মমরণ।
দেখেছি গৃহস্থের বাটী, — ঝাটা দিয়ে সকল ঝাটি,
পচা পচ্‌লা বিষ্ঠা, মাটি — এক জায়গাতে করে রক্ষণ।
ক'দিন পরে সার ভাবিয়ে — নেয় তারে মাথে তুলিয়ে,
ফসল গাছের গোড়ায় দিয়ে — আনন্দিত চাষার মন।
সার পেয়ে তার জোরের চোটে, — ফল ধরে, তায় ফুল ফুটে,
মনমোহন কয় অম্‌নি বটে, — অমন তোমার সাধন ভজন।

আমার আরম্ভ ও শেষ সকলই খাপ ছাড়া, লয়-ছাড়া, মিল ছাড়া ; নৈলে, ও কি বল্‌তে মাঝখানে কতকগুলি বকাবকি ছুটে গেল। তোমরা, হয়ত নারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করবে।–আমি বলি ! ওটা তোমাদের জন্যই থাক্। আমার ব্যবস্থা আমিই ভাল জানি। আমার রোগে, শোকে হা-হুতাশে কল্পনা নাই, কার্য্যের আগে পাছে সঙ্কল্প নাই,–তা ব'লেই ত আমি পাগল, আর তোমরা ভাল মানুষ। বলি, ভাল মানুষ হইয়া তোমরা এত দৌড়াও কেন ? এত ছুটাছুটি কর কেন ? হাজার হাজার কিতাব প'ড়েছ, বক্তৃতায় বুক চিৎ করিয়া নাম জাহির করিয়াছ, উপন্যাসে, নবন্যাসে প্রাণখানা মাখামাখি করতে যেয়ে কতবার উবোৎ, কত বার চিৎ হ'য়েছ, শ্রীকৃষ্ণের চৌদ্দ পুরুষের নাম মুখস্থ, রামলীলায়, আর রাধার মানে কান্নার ফোয়ারা ছুটে, দেখতে পাই, দর্শনশাস্ত্র পড়ে পড়ে আঁখি অন্ধ।–বলি, এত গোলযোগের পরিসমাপ্তি কই ? সুরাপানে ঢল্ ঢল্, গাঁজার নিশায় ছল্ ছল্, জ্বল্ জ্বল্ করে আঁখি জ্বল্‌তেছে, আর খল্ খল্ ক'রে হাস্‌তেছ ক্ষণে ক্ষণে ভৈরব রবে,

কখন বা হা-হুতাশে, নীরব রাগিণীতে 'কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম হরিবোল' বলে ধ্বনি কর্‌তেছ, আর কখন তালে, কখন বেতালে, কখন খেমটায়, কখন খেয়ালে, কখন ধামালে, কখন চৌতালে, তালে তালে তাল দিয়া ফাল্ দিতেছ,– কেন দিতেছ ? শাস্ত্র গ্রন্থ তো খুঁজে দেখ্‌লে ?–নিজকে নিজ জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছ কি ? যদি বল–দেখি নাই ; তবে তুমি হার মানিয়াছ, দাবা খেলায় মাত্ হ'য়েছ, পাশা খেলায় কাঁচা গুটী, আর তাস খেলায় ব্যোম, হ'য়ে গেছ। তা'হলে তুমি হিসাব ক'রে দেখ, বোধ হয় ক্ষণে ক্ষণে জেগেও উঠ্‌তে পারে, একবার ভেবে দেখ, জীবনাবধি যা ক'রেছ–সব ভুল ক'রেছ, ভুল দে'খেছ, ভুল বু'ঝেছ, কেবল ভুলে ভুলে হে'লে দোলে গড়ায়ে এসে, যেন কোথাকার এক ঢেউয়ে ঢেউয়ে, এই মুহূর্ত্তে এখানে তুমি বসে আছ, শুয়েছ, কাঁদতেছ, হাস্‌তেছ এবং বাজারের দর বুঝ্‌তে পার নাই বলে, লোকসানে মূল হারায়ে, এখন অকুল নদীর ঢেউ গণ্‌তেছ। অতি শৈশবে ছিলে মায়ের কোলে, যে সময় যম রাজার মায় দোল দিচ্ছে বলে ঘুমের ঘরে হাসি কান্না খেলেছ। তারপর মার আঁচল ধরা কোলে পুতুল খেলায় বাতুল হ'য়ে–কত অপ্রতুলের সৃষ্টি করেছ, তারপর দৌড় খেলা, আর ধামাল খেলা, মাঝে মাঝে, বাবুয়ানার বাহার, কত আশা, কত ভালবাসা, কত উজান ঢেউ, কত ভাটির তান, কত হাসি মুখ, কত মনগড়া সুখ, কত ভরা ভরা বুক, কত দালান, কত কোঠা, কত আসল, কত ঝুটা, ভোর ভোর কত ভাবনা, কত চপলার ঝিকিমিকি, ফুল কলির উঁকিঝুকি, বাতাসের শোঁ শোঁ, রঙ্গে বদরঙ্গে সং এর সাজে ঢেউ খেলিয়ে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে, মারামারি, কাড়াকাড়ি, হুড়হুড়ি কর্‌তে কর্‌তে পাড়–নাই-দেশের দিকে পাড় পাবে বলে ছুটে যে'তেছে। পাখী গায়, এদিক ওদিক চায়, আর পাখা নাড়ে ; শিয়ালটা ডাকে, ভেড়াটা চেঁচায়, গাছের পাতাটা নড়ে, আর ঐ বাতিটার কাছে কতকগুলি ফড়িং উড়ে উড়ে পড়ে, আর মরে।

বাজারে বড় গোলমাল, বড় হাক্ ডাক্-চাউল কই, মাছ কই, চাউল কত, মাছ কত, ডাল কত, খইল কত, এটা কত, ওটা কত,–এই বলে ডাকাডাকি হাকাহাকি, জোরাজোরি, আর পয়সার ঝন্‌ঝনি, পায়ে কাঁদা, ঘাড়ে বোঝা, এক দিচ্ছে, নিচ্ছে, আর দৌড়াচ্ছে, মিঠাই ওয়ালার দোকানে বড় ভিড়, মদ-গন্ধে মধুপোকা গুলা উড়ছে, পড়ছে আর প্রাণ দিচ্ছে। ও বেটার গায়ে বড় দাদ, চুলকানি, হা ক'রে আচ্ছা রকম বদনভঙ্গী করিয়া চুলকাচ্ছে, ক্ষণপরে জ্বালা–জ্বালা–জ্বালা–প্রাণ যায়।

আথাল পাথাল জলে খাল, বিল, নদী, পুকুর, পাড় ভ;রে উপর দিয়া জল ছুটছে, কত পিঁপ্‌ড়ে, কীট, পোকা, তার ভিতর ঢুকছে, জল যতই কম্‌ছে ততই তার দাগ থেকে যাচ্ছে। এই শোঁ শোঁ শোঁ, অম্‌নি নীরব,–এই ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ, অমনি নীরব,–এই ঢং ঢং ঢং, অম্‌নি নীরব – এই গুম্‌, গুম্‌, গুম্‌, অম্‌নি নীরব–এই ধপধপ্‌ ধপাধপ্‌ অম্‌নি নীরব,–ছাই মাটী, ধুলা উড়ে, পাতা পড়ে, এই ফরসা, এই কুয়াসা।

আমার এইটুকু, তোমার ও টুক, হাসির লাগি, ধনের লাগি, মানের লাগি, যশের লাগি, ভাবের লাগি, পাবার লাগি, থু'বার লাগি, গড়বার লাগি, ভাঙবার লাগি, আক্‌বার লাগি, মুছবার লাগি, রঙ্গপুরের রঙ্গ বাজারে রঙ্গে বদরঙে বেচা কেনা। ধনীতে মানীতে, রাজাতে প্রজাতে, কানাতে খোঁড়াতে, হাদাতে গোদাতে, হারামজাদায় বজ্জাতে, হিংসুকে নিন্দুকে, কেবল পটাপট, হটাহট্‌, লট্টালট, লট্‌কী খেল্‌ছে।

বম্‌ ভোলানাথ!–বলি, কে রে? কে রে? কে রে? আমি কে রে? তুমি কে রে? সে কে রে? পাগলটা খেপে উঠ্‌লে, পাছ থেকে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ কচ্ছে, আর ছেলেগুলা করতালি দিয়া কেবল দৌঁড়াচ্ছে।

উঃ মানুষগুলা কি রকম,– কি করে? কি চায়?– বলি, মানুষগুলা এত দৌঁড়াচ্ছে কেন? এত কলরব কেন? কি চায়– কেবল জুড়াতে চায়আগুন-আগুন-আগুন ধু ধু ধু যুবকের প্রাণে,– এ কথায় ও কথায় ধু ধু ধু পৌঢ়ের প্রাণে গড়পরতার ধু ধু ধু, বৃদ্ধের প্রাণে হিসাব নিকাশে ধু ধু ধু, সন্মুখে একটি রেখা সীমা নাই, অন্ত নাই, ধু ধু ধু, ছোট খাট কয়টী স্তর, উঠা নামার কয়টী জায়গা, হাসি কান্নার কয়টী ঢেউ, চুম্বন আলিঙ্গনের কয়টী ঝিকিমিকি, শঠতা, চাতুরীর কয়টী কচ্‌কচি, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের লেখা দুপিঠ-সাদা একখানা উপন্যাস, হরপগুলা কাটাকুটা কমলজাদা, কৈফিয়ত নই, বকলম দস্তখত নাই, পাগলের রেজিষ্টারী আফিসে নিলে সবগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কে না ; চৌহুদ্দি ও পরিমাণ ছাড়া জমির কবলা অগ্রাহ্য। বিক্রীদার খরিদ্‌দারকে চিনে না, সনাক্তকারীর অভাব, উঃ কি জ্বালা! কোথায় জুড়াই।

পথে যে'তে যে'তে পাগল একটি টাকা কুড়ায়ে পে'ল, অম্‌নি তার প্রাণের হরবোলা বুলি ভুলে গিয়ে হাজার হাজার অভাব জেগে উঠ্‌ল, কি গড়বে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ছ'মাইল পথ চলে গেছে ; এমন সময় একমহাজন হাজার লাখ তোড়া টাকা গণ্‌তেছে দেখতে পেয়ে, কি জানি কি মনে ক'রে; তার টাকাটা তার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে দৌঁড়-দৌঁড়-দৌঁড়। মহাজন আবার তারে দৌঁড়িয়ে ধরে আন্‌ল, জিজ্ঞাসা করে–এ কি রে পাগল? পাগল ভাল করেছে বলেই হুহু করে হেসে উঠ্‌ল; বড় জোর জব্বরের জোগাড় দেখে পাগল কয়–হ্যারে! হ্যারে! শোন্‌ শোন্‌ একটি টাকা পেয়েছি অবধি আমাকে হাজার কুড্ডুল ফিকে মার্‌ছে, মহাজনের কাছ থেকে ধরে নিয়ে কত নাকাল বানাচ্ছে, হাজার পিপ্‌ড়া গায় জড়িয়ে দিচ্ছে, একটায় হাজার করে তোমরা এতগুলির কামড় সয়ে আছ, তাই বলে আমায় সেটীও তোমাদিগকে দিয়া, নীরব হয়ে চ'লে যাচ্ছি। এখন আর আমার অভাব নাই। কি কারখানা!–তার ইহা, ও বেটার উহা; – কেবল জ্বালা-, জ্বালা জুড়ায় কিসে? কেন এত করে?– জুড়াবার লাগি? বলি জুড়ায় কিসে? শোন্‌ শোন্‌, ঐ পাগল গায় :

ধূ ধূ করি শুধু হৃদয়-শ্মশানে অনলে অনিলে, পেতেছে খেলা ;
কামিনী কাঞ্চন, বাসনা কামনা, যোগাইছে তারা কাঠ, খড়ি, চেলা।
জল জল করি শুনি কোলাহল,
কোথা পাবে জল? পিয়ে হলাহল,
আবেশে বিহ্বল, ফুৎকারে অনল, আশা মায়াবিনী সুচতুরা বালা
দূরে কাল মেঘ সাজিছে কোণে,
গুরু গরজন পশিছে কাণে।
আকাশে বাতাসে উঠিয়ে ধুঁয়া আঁধারে ডুবিছে আলোকমালা।
ধীরে ধীরে পাখী যাইছে নীড়ে,
সম্মুখে আঁধারে আসিছে ঘিরে,
ঐ দেখা যায়, অমনি লুকায়, পথিকের চোখে চমকে চপলা
গৃধিনী শকুনি শিবা আর কাক
ডাকিছে কৌতুকে, শুনা যায় ডাক,
বেতাল ভৈরব চৌদিকে নাচিছে, শাখিনী প্রেতিনী ভূত প্রেতগুলা।
ঘোর অমাবস্যা অন্ধকার ঘোরে,
বিভীষিকাময় এ শ্মশান' পরে
কামনা-চণ্ডাল শব বক্ষোপরে বসিয়াছে মনো নিয়ে জপের মালা।
এ শব-সাধনা অতি ভয়ঙ্কর–
চীৎকার ফুৎকারে কম্পিত অন্তর,
ভরসা কেবল শ্রীপদ নির্ভর, মুখে মাত্র বাণী-বমবম্‌ ভোলা।



আমিত্বের প্রসার

সকলেই মনে করে যে, আমি বেশ বুঝি,–আমার মত কেউ বুঝে না, কেউ জানে না। যখন একা একা থাকি তখনও ভিতরে কে জানি ক্ষীণ স্বরে গায়–আমি এতকজন ভাল লোক ; আর দশের মধ্যে যখন বসি, যখন মিশি, তখন কথায় কথায় কেবল আমি যে ভাল, আমি যে জ্ঞানী, আমি যে সমর্থ, তাই জানা'তে প্রাণের ভিতর মিষ্টি মিষ্টি হাসি ফুটে, আর বুক ফুলাইয়া ঢাকে ঢোলে, শঙ্খ করতালে জাহির হই। আমি যা বুঝি, তা ঠিক, আর দশজনে যা বুঝে, তা গোলমেলে–এই একটি ধারণা সর্ব্বদাই তাড়না করিতেছে,–এই ফোয়ারার চোটে, ষ্টিমের ঠেলায়, সব নলগুলা থক্ থক্ ক'রে কেঁপে উঠে, আর মানুষগুলা হৈচৈ হৈচৈ ক'রে ঘুরে–মানুষ বুঝে ইহার কর্ম্ম, ইহার কর্তব্য। এই টানে প্রাণে প্রাণে কেবল ঝুকাঝুকি-বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই,–এখন বলত, ইহা ভ্রান্তি না সত্য? তোমরা অনেক, আমি একা, হয়তঃ কোলাহল করিয়া কান ফাটাইয়া দিবে,– তা হ'লে আর গরীব বেচারার উপায় নাই, শ্রুতিপটাহ ফাটিয়া যাইবে। না, তোমাদের আর বলিতে হইবে না। কল্পনা কৌতকী কবি পরমুখাপেক্ষী হইতে ভালবাসে না। প্রকৃতির অন্তরালে সকল প্রশ্নোত্তরের বীজ নিহিত রহিয়াছে–জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর মিলে। কেবল প্রশ্ন–উত্তর, প্রশ্ন-উত্তর। তারপর, তারপর–এই নিয়াই ত অতবড়, ক্ষুদ্র প্রকাণ্ড সমষ্টি ব্যষ্টি, সকল আসল নকল হরদমে স্বভাবের পর স্বভাব সৃষ্টি করিতেছে। স্বভাবের ভাবাভাবে যে দৃষ্টি করে, সে পাগল ; আর–বাঁধা–ধরা একটা গোলমেলে হট্টগোল স্বভাব নিয়ে যারা খুব ধামাল বাজা'তে পারে, তারা ভাল মানুষ। নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বলেন– "আপ্‌নে আপ্‌নে বলে বড়, তারে কয় লগ্‌গূ দড়," আপনা হ'তে সবাই বড় বিধানে বিচার। তুমি কোন নীতির ধার ধার না, হুজুগে সতর আনা, তুমি একজন বুক ফুলাইয়া ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করিতে ব্যস্ত, সালিসি মোড়লীতে পাক্কা খেলোয়ার! –হ্যারে, অনন্তকাল গর্ব্ভে অপোগণ্ড শিশু, তোমার এই বুদ্ধির নাড়াচাড়া-ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া যারে বুঝ–সেই পতঙ্গটীর পক্ষসঞ্চালন হইতে কোনও মতে যুক্তিযুক্ত নহে ; বরং তাহার পাখা নাড়াতে রসময়ের রসিকতার পরিচয় খোলে, আর তোমার হাত নাড়াতে দেশের দশের বিরক্তি উৎপাদন বই আর কি হয়?–বল দেখি, আর কি হয়? স্বার্থ–স্বার্থ, এই ত

তোমার দম্ ফাটা চীৎকার? এই ত তোমার সপ্তস্বরে ধ্রুপদ রাগের আলাপচারী? আচ্ছা, দেখ দেখি এই স্বার্থপরতার গোড়ায় কি, আগায় কি, আর মাঝখানে কি? গোড়ায়-হলাহল, আগায় হাহাকার, আর মাঝখানে–কতকগুলা হিজিবিজি বই ত নয়? বলি, তবে কেন এত লাফালাফি হাম্‌বড়া হাম্‌বড়া, হাম্বা হাম্বা ডাক ; গৃধিনী শুকুনীর ভক্ষ্য বস্তু, ছাইভস্ম,.হ্রস্ব হওয়ার অভিধান খুলে দেখা কি তোমার উচিত নয়? কেবল দীর্ঘ হ'তে ধাক্কাধাক্কি ক'রে উপসর্গ বাড়াইতে কেন লালায়িত? ঐ স্বভাবের পাখী নিবিড় শ্যামল পত্রচ্ছায়ায়, লোকচক্ষুর আড়ালে লুকাইয়া গায় ;–

সুখ আশে মর ঘরে,
সুখ কোথা পাবে নর?
যত সুখ চাও, তত
দুঃখ বাড়ে গুরতর।

এই দিবার পর রাতি, আর রাতির পর দিবা–আসে আর যায়। আর তোদের ঠেলাঠেলি দেখে চাঁদটা মাসে মাসে আঁধারে ডুবে যায়, আবার কি জানি কি ভেবে একদিন হে'সে উঠে, সূর্য্যটা কখন উত্তরে কখন দক্ষিণে স'রে স'রে থাকে। যে ভাসে, সে আবার ডুবে ; যে হাসে, সে আবার কাঁদে; যে নাচে, সে আবার থামে ; যে বাড়ে সে আবার কমে; যে উঠে, সে আবার নামে ;–ক্রমে ক্রমে এই সব হ'তে হয়। তবে কেন হাম্‌বড়া? তুমি কতখানি, তুমি কতটুক-বলি, তুই কে? একটা স্ফুলিঙ্গের কণা বই ত নয়! তবে তুই বড় কিসে? ব্রহ্মাণ্ডটা বুঝি চোখে ভাসে না? আকাশের তারাগুলি বুঝি আর মিটিমিটি হাসে না? ফুলকলিগুলি উঁকি দিয়ে বুঝি আর লুকি দিতে চোখে দেখা যায় না? তোদের চোখগুলা কেবল জমা খরচের দৈনিকে, আর মাসকাবারে বদ্ধ থাকে কিনা, গৃহিনীর গৃহিনীপনার বদ্ধ থাকে কিনা, সিন্দুকের প্রকোষ্টে বদ্ধ থাকে কিনা, বিছানার খাটে বদ্ধ থাকে কিনা, আরও আইন আদালতের পেছেপাছে অত বড় মানুষ তুমি গুড়গুড়ির নলে থাকিয়া তনু হেলাইয়া রামচাঁদ কৈবর্ত্ত গরীব বেচারা জুমিজমার ক্রোকে বদ্ধ আছে কিনা, দেলখোস কুন্তলীনে, জলের গ্লাসে, পানের ডিবায়, আর হরি সিং চৌকিদারকে ধম্‌কাইত বদ্ধ আছে কিনা, আর ঐ টাকার থলিটা, লোটাটা, বাটিটা তাই নিয়ে বদ্ধ আছে কিনা, কাজেই –তুমি এই জমিটুকুর মধ্যে অত বড় একটা ষণ্ডামার্ক। এই কথায় একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

একদিন অতি প্রত্যুষে তিনটি গৃহস্থের বউ, মেয়ে কলসী কাঁকে নদীর ঘাটে জল আনিতে রওয়ানা হয়েছে। এমন সময় এক পুলিশের দারোগা বাবু

গ্রামের চোর বদ্‌মায়েস তদারকে আসিতেছিলেন, দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া চোর চোর বলিয়া পাক্‌ড়াও করিল, বউ বেচারীরা লজ্জা ভয়ে আস্তেব্যস্তে পাশে সরিতেছিল। এমন সময়ে দুই তিনটা যমদূত ধরিতে যাইয়া দেখে তাহাদের ধারণা ভুল। অম্‌নি দে চম্পট-ছুটিয়া চলিল; তখন তাহাদের মধ্যে একট বলিয়া উঠিল, এইটা ত এমন, দ্বিতীয় জন বলিল, - এমন হইলেও তেমন নাই ; তৃতীয় জন বলিল-এইটা এম্‌নেই এমন। আমাদের রসিকচাঁদ সেখানে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল ; ঘটনার পর এইরকম কথোপকথন শুনিয়া, কিছুমাত্র অর্থবোধ করিতে না পারিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল-হ্যাগো! তোমাদের এ কথার অর্থ কি? তখন তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রাচীনা বলিলেন, "বৎস তার অর্থ এই-এই আহাম্মকের কার্যদৃষ্টে আমি বলিলাম, এইটা ত এমন, অর্থাৎ এইটা কি গরু? দ্বিতীয়া বলিলেন, এমন হইলেও তেমন নাই, অর্থাৎ গরু হইলেও শিং নাই; তৃতীয় বলিল এমনেই এমন, অর্থাৎ শিং না থাকিলেও গুরু বটে-তবে এই ত হ'ল! বম্‌ ভোলানাথ, বুদ্ধিখোরের বুদ্ধিশুদ্ধির অভাবে হাম্‌বড়া হ'তে গিয়ে শেষে নাকাল বানিয়ে দেয়। সকলই বুঝে,-বুঝাইতে বুঝে, কিন্তু বুঝিতে বুঝে না ; সকলই দেখে -দেখাইতে দেখে, কিন্তু দেখিতে দেখে না ; সকলে শুনে-শুনাইতে শুনে, কিন্তু শুনিতে শুনে না। যারা দেখার মত দেখে, শুনার মত শুনে, বুঝার মত বুঝে, কিম্বা বুঝিতে শুনিতে দেখিতে চায়-তারাই পাগল, আর যারা হাম্‌বড়া-তারাই ভাল মানুষ। এদের সংখ্যা বেশী, পাগলের সংখ্যা কম, তাই তাদের কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়া উঠে না; মুটে মজুরকে ধম্‌কাইয়া ক্রমেই আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যায়, পর্‌দার পর পরদা খাটাইয়া অন্ধ, বোবা, কালা হ'য়ে যায় ; আর পরদার পর পর্দা ছুটাইয়া বে-পরদা লোকে তারে পাগল বলে, ঘৃণা করে। তোদের সর্ব্বস্ব অহঙ্কারের ভিতর, পাগলের সর্ব্বস্ব অহঙ্কার ছাড়াইয়া কিছু নাই-অথচ জগত লইয়া-তাই সে গুলিখোর বুদ্ধিমানের চোখের কাছে বিষের গুলি। বলি আর এক পরদা সুর নামাইয়া দাও, তাতে তোমারও মিষ্টি, আমারও মিষ্টি, সৃষ্টিটা রক্ষা পাউক। নৈলে তার ছিঁড়িয়া হতভম্ব, বম্‌ ভোলানাথ ! মহাশয় গো, নমস্কার-আসি।

"আনন্দ বাজারে যাবি?-
আয় না,
পথ দেখা'য়ে নিয়ে যাবে
আমার পাগল ময়না।"



প্রার্থনা

দয়াময়, দুঃখ জানা'ব আর কার কাছে,
তুমি বিনে, নাথ! আমার ত্রিভূবনে আর কে আছে?
হরি অনাথ শরণ, পতিত-পাবন, অধম-তারণ, জ্ঞানী বলেছে।

করুণাময় হরি! তোমার ইচ্ছা কি? জগৎ পদ্ধতির প্রত্যেক অণু-পরমাণুর দিকে দৃষ্টি করিলেই যেন কেমন কেমন একটা বিসদৃশ, বৈলক্ষণ্য ভাব দেখা যায়। যদিও অনুকূল প্রতিকূল ব্যাপার মঙ্গলেরই কার্য্য, তবুও যেন কি এক ভাব ভিতরে থাকিয়া নিয়ত বৈলক্ষণ্য দেখাইয়া দিতেছে, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইতেছি না। জানি না, ভিখারীর শিরে বজ্রাঘাত এবং ধনীর শিরে পুষ্পবৃষ্টি তোমার কোন্ ইচ্ছার কার্য্য। তবে কি তুমি যাহাদিগকে ভালবাস, যে তোমার স্নেহের পাত্র, সেই সুখী? তা'হলে, তোমার সমদর্শিতা থাকে কৈ? নিরপক্ষপাতিত্ব থাকে কই?

তুমি যাহাকে দিয়াছ, সে তোমাকে দিয়েছে, তুমি নাকি যাকে বঞ্চিত করেছ, সে কোথা হ'তে কি দিবে? কিন্তু নাথ! এই-যে যদি তোমার ইচ্ছা তবে ভিখারীর হৃদয়ের আবেগ কামনা ইহাতেই শান্তিলাভ করিয়া থাকে না কেন? তোমার ইচ্ছার গতি ভেদ করিয়া কি তাহাদের অন্তরাত্মা ধাবিত হয়-ইহা কি সম্ভবে? কভু নয়!! কৈ প্রভো! লক্ষপতি হ'তে সামান্য ভিখারী পর্যন্ত কাহারও ত হৃদয়ের বেগ শান্ত হ'তে কিম্বা আশার গতি নিবৃত্ত হ'তে দেখিতেছি না,-তোমার অসীম ইচ্ছার শেষ সীমা কোথায়, প্রভো?- শেষ সীমা কোথায়? তুমি আশা দিয়ে লাঞ্ছিত করিবে ইহাই তোমার বাসনা! জীবে এমন কি দোষ করিয়াছে যে, তাহা দিগকে লাঞ্ছনা দিবে? তুমি যা করাও, তাই করি-এই মাত্র জানি। তবে তাহাতে এমন বিসদৃশ ব্যাপার কেন, নাথ? এ আশার কি একটী শেষ সীমা নাই-বাসনার কি বসতিস্থান রাখ নাই? যদি রাখিয়া থাক, তবে সে কোথায়? একবার দেখিতে পাই না? দেখায়ে দাওনা!- তৃপ্তি পাই। অতৃপ্ত হৃদয়ের কোলাহল শুনিতে ভালবাস, তাই বুঝি তৃপ্তি দাও না, এবং সংসারে অতৃপ্ত আশার ছবি গড়িয়া রেখেছ, এই নাকি কথা?-"না" তা হ'লে কি তোমার "ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু" বলিত?-কখনও না ; তবে কি কাতর প্রাণের ডাক শুনিতে, প্রভো!

জগৎপদ্ধতিতে দোষ রাখিয়াছ, অপূর্ণ রাখিয়াছ, হা নাথ! তা হ'লে তুমি এ দীন ভিখারীর অস্ফুট অব্যক্ত স্বর শুনে থাক!! কাতর প্রাণের ক্ষীণ কণ্ঠের রোদন ধ্বনি শুনে থাক, এবং শুনিবার জন্যই চিত্তবিনোদনার্থেই আমায়-অথবা–আমাদিগকে এমন করে গড়েছ। আহা কি আহ্লাদ, প্রভো! আমার কণ্ঠরব শু'নে থাকে! তা ভাল, হে নাথ!

আমি শত দুঃখ পাই,
তাতে কিছু ক্ষতি নাই,
তবু নাথ পূর্ণ হ'ক্ ইচ্ছাটী তোমার।

হে দীননাথ! দয়াময়! বাবা! সুখী হও !!! দয়াময়! দয়া কি? দয়া কাহাকে বলে? দয়া দানের বস্তু। তুমি দাতা–কেমন জনে দিতে হয়, ভিখারীইত চিরকাল প্রার্থী। তবে এ ভিখারী দয়া পদার্থ পায় না কেন? বুঝে না কেন?– না, আজিও কান্নার শেষ হয় নাই ..... অথবা এমন কান্না কাঁদে নাই, যাহাতে তোমার দয়া ধনের ভিখারী হ'তে পারে। ভাঙ্গা হৃদয়ের অশ্রুজলে তোমার হৃদয় বিগলত হয় নাই। তবে প্রভো! দয়াময় নামের সার্থকতা থাকে কৈ? দয়া করিবে-বিপন্নকে আশ্রয় দিবে, আশ্বাস দিবে ; প্রহেলিকামুগ্ধ জীবকে সত্যের ছবি দেখাইয়ে প্রকৃতিস্থ করিবে ; অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি আসিবে, –এই তো কথা! তবে এমনতর দেখি কেন? সুখ দুঃখের সমতা নাই কেন? জগতে বিষণ্ণতা কেন? দয়াময়!–তুমি দয়াময়, আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি দয়াময়। তাই বলি হে নাথ! হে প্রভো! হে দেব! হে কাঙ্গালের সখা! দ্বীনের প্রাণ! ভক্তের জীবন! মধুর দয়ার মুরতি। দয়ার ছবি দয়াময়! একবার তোমায় বলি, তোমার পায়ে পড়ি, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার রাঙ্গা টুকটুকে, ভকতস্বত্ব চরণ দু'খানির, আমার একটি কথা রাখ! কিছু করতে হইবেনা, কোথাও যাইতে হইবে না, ঠাকুর! তুমি ইচ্ছা করিলেই পার, তাই বলি এবং তাই বলেই প্রার্থনা করি–ওঃ আর দেখিতে পাইতেছি না, অসহ্য ব্যাপার, দেব! হে দেবদেব! অসহ্য ব্যাপার, তুমি কি দেখিতে পাও না?–তোমার হৃদয়ে কষ্ট হয় না? যদি হয়, হে মহান্ ঈশ্বর! যদি জগতের এই সব বিভীষিকা, প্রহেলিকা এই যে, ভূতি কাণ্ডকারখানাতে পড়িয়া জগত পেষিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া যদি তোমার কষ্ট হয়–আর যদি নাও হয়, দয়াময়! যদি নাও হয়, তবু বলি,–তুমি অজস্র দয়া বর্ষণ কর দয়াল! অজস্র দয়া বর্ষণ কর। কেন করিবে না? তুমি যে দয়াময়? তাই বল অন্ততঃ তোমার এই দীন ভিখারীর প্রার্থনাতে, অজস্র দয়া

বর্ষণ কর, না হয় স্বকীয় কৃপার বশে অজস্র দয়া বর্ষণ কর, ঘুচিয়া যাক্ রোগ শোক দূরে যা'ক জ্বালা-যন্ত্রণা, পরাজিত হ'ক বাসনা পিশাচী,–কেমন তাই করনা কেন? তবে তুমি, হে নাথ! তা' হ'লে তুমি দয়াময় নও! তুমি পূর্ণ নও! যত দিন জগতে বিশৃঙ্খলা ভাব দর্শন করিব, ততদিন তোমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিতে পারিব না, যেহেতু জগত কি তোমার ইচ্ছার ছায়া নয়?

ইচ্ছাময়! তোমার কি আকাশ-পাতাল ইচ্ছা কিছুই বুঝিতে পারি না–কোথা দিয়ে, কোনদিকে, কিভাবে যাও, কিভাবে যায়–তাহা তুমিই জান। তুমি কোথায় থাক জানি না–হৃদয়টা যেন কার পানে টানে, দিন নাই, রাত নাই-টানে, শয়নে স্বপনে টানে; কিন্তু চিন্তা প্রবাহিনী বাসনা-তটিনীতে বর্ষার জোয়ার-তবে ভাটাও আছে, না আছে তা নয়, ভক্তি ঝরণা শুকাইয়া যেতেছে, আর ঝরে না ; প্রেমসরঃ বিশ্বাস-প্রীতির উৎস্য অনুকূল স্রোতে পড়িয়া ভাটা, শরতকালীন হেমন্তের আভাস!...... হায়! কিসে কি হ'ল এবং হইতেছে,–একই জীবনে, একই সময়ে শরৎ, বর্ষার খেলা-জোয়ার ভাটা, বিপরীত, বিপরীত!... না হবে কেন? সাধে কি তোমার জগৎপদ্ধতিতে দোষারোপ করি, কিসে কি হয়,–সামঞ্জস্য দেখি না কেন, প্রভো! বল দেখি এ কোন টান্– এ তো প্রাণহন্তারক জলৌকার আকর্ষণ বই আর কিছুই নয়?– ধন্য প্রভো! তোমার মায়া প্রহেলিকার বিভূতি দর্শন!

কৃপানাথ! তুমি কি আমায় মারিবে? কেন আগুন জ্বালিয়ে দিলে হৃদয় মাঝে, প্রাণের নিভৃত লুকান প্রদেশে? কেন প্রভো! প্রভো! তুমি প্রভু হ'য়ে কেন দাসের হৃদয় কুঠরী জ্বালায়ে দিলে? দিয়েছ,–ভালই করেছ ; কিন্তু এ কোন্ ভাবের অনল? যে অনলে যা পুড়িবার, তা না পুড়ে অতি আদরের, অতি স্নেহের, দরিদ্রের সম্বল, জীবনোপায়ের একমাত্র অবলম্বন, থাল ভরা রতন মণি পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যেতেছে! হা নাথ! এই কি তোমার ইচ্ছা? আর কত জ্বালাবে, বল দেখি, দয়ার ঠাকুর! আর কত, আর কত জ্বালাবে! দয়াময়, যাই কর না কেন, তোমায় ডাক্‌লে এটকু শান্তি পাই, ... তুমি আছ, এই কথা বিশ্বাসে আসিলে হৃদয় নৃত্য করে, যেন কতকিছু সুখে আমোদে মাতেয়ারা হয়ে আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে নৃত্যু করে। –তাই বলে, নতুবা.... হে নাথ! নতুবা .... তাই বলে, দু'একবার তোমার নাম নিয়ে হাহাকার কোরে মনের উচ্ছ্বাস মিটাই। রাগ হ'তে পার, হও। ভস্ম করিয়ে ফেল, আগুনে আগুনে ভস্ম হ'য়ে উড়ে যাই, তাও ভাল, মন্দ নয়!-কেমন তাই কি করিবে?

যদি ওহে প্রেমময়!
অনন্ত বিষাদ হ'তে না কর নিস্তার,
তবে নাথ! কর তাই,
ভস্ম কর উড়ে যাই,
ঘুচুক জীবনের চির বিষাদ অপার
জুড়া'তে হৃদয়-তাত! এই প্রতীকার।

কৃপাময়! আর কিছু নয়, একবার দীনের পানে ফিরে চাও–এই প্রার্থনা। হে সত্যস্বরূপ! শান্তির ছবি! সত্যের ও শান্তির হৃদয় জুড়ান চেহারাতে হৃদয়ে প্রকাশিত হও, একটানা স্রোতে হৃদয় নদী বহিয়া যা'ক প্রাণপাখী নিবিড় বনে, নীরব মনে, আপন বাসায় খাদ্য পেয়ে সদানন্দ চিত্তে বসিয়া বসিয়া জগৎপদ্ধতি দর্শন করুক-ইহাই প্রার্থনা। পুরিবে কি দীনের আশা, পুরিবে কি দীনের বাসনা! জয় করুণাময়-হরি দয়াময়-আর কি বলিব, শেষ কথা॥

থাক্‌তে এ'সে গেলাম চলে,
হাস্‌তে এসে কেঁদে গেলাম ;
মা! তোরে না দেখে নিরাশ হ'লাম,
জীবন দিলাম কালের কোলে।



বৈঠকী রহস্য

পল্লীগ্রামে গ্রাম দেবতা হরিশ বাবুর বৈঠখানা। পূজার ছুটী গ্রামের প্রবাসী সকল বাড়ী আসিয়াছে। বেলা অপরাহ্ন, বাবু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া পান চিবাইতেছেন, হারু সিংহ কল্কেটা উবোৎ করিয়া ছিলিম যোগাইবার ব্যবস্থা দেখিতেছে। ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাপড়, দক্ষিণা, ফলার প্রভৃতি বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া টিকি নাড়িতে নাড়িতে, নামাবলী গায়, ছেঁড়া চটী পায়, আস্তে আস্তে বৈঠকখানায় হাজির; পাছে রাম ঠাকুর, শ্যাম ঠাকুর, কেদার সিং আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে পা-ভাঙ্গা চেয়ারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, টুলে ঠাকুরের দল, গাছ পীড়িতে সিং মহাশয়রা ব'সে গেলেন। ঘন ঘন তামাকের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল, ক্রমে একথা সে কথার পর গ্রামের অকর্ম্মণ্য চাটুকার দল হইতে কতকজন আসিয়া জমিল ও ক্রমে ক্রমে বিদেশ প্রত্যাগত বাবুর দল, বয়স্যের দল ; – বৈঠক গুল্‌জার।

আলোচনা, একথা সেকথা, গতবারের পূজার কথা, পিতামহের আমলের পূজার কথা, চৌধুরী বাড়ীর পূজার কথা, তারপর ছেলেদের কথা, অমুক ভাল ছেলে, অমুক মন্দ ছেলে,–তারপর গ্রামের সাধারণের কথা,–অমুক ভাল মানুষ, অমুক মন্দ মানষ, অমুক স্বার্থপর, অমুকের বদ-মিজাজ, তারপর, অমুক চোর, অমুক বদ্‌মায়েস্, ইত্যাদি ইত্যাদি কথোপকথন চলিতেছে। মাঝে মাঝে হাসির ফোয়ারা, রঙ্গ রসিকতা অশ্লীলতা, ভ্রুকুটী কোন বিষয়ে ত্রুটী নাই।

পাগলটা আড়ালে দাঁড়ায়ে দেখ্‌তেছিল, হাস্‌তেছিল, আর ভাব্‌তেছিল। কি ভাব্‌তেছিল?–না, পাগলের সামালোচনা। ইতিমধ্যে এক বাউল ভিক্ষার জন্য বাবুর দরজায় দণ্ডায়মান,– "বাবু কিছু ভিক্ মিলেগো?" অম্‌নি "যা বেটা, –যা-এখানে কিছু পাওয়া যাবে না", এই বলিয়া কর্ত্তার মুখ হইতে বিরক্তি প্রকাশ। ক্রমে, বাউলের দল, বৈরাগীর দল, সাধুর দল, সন্ন্যাসীর দল,–এরা যত অপকর্ম্ম করে, আর বাবু যত সৎকর্ম্ম করেন ইত্যাদি ক্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গভীর মন্তব্য প্রকাশ ; মাঝে মাঝে ভট্টাচর্য্য মহাশয়ের পিতামহের আমলের দু'একটি শ্লোক আওড়ান, পরে উহা মানুষের অসাধ্য, উহা মানুষে পারে না" কিয়ৎ পরে, ধর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তু বর্ত্তমান জগতে নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি মীমাংসা হইয়া গেল।

পাগল, তা'র মাকে মাঝে উত্তেজিত হইয়া, ব'কে উঠে,–আর লোকে হাসে। কি বকে? প্রথম বকা এই কথা–তোমরা যে বল, অমুক ভাল না, অমুক সাধু না, এই কথার অর্থ কি? আমি বলি–যে তোমার মত না, সে-ই তোমার কাছে ভাল

না, অথবা যে যাহার মত না, সে-ই তাহার কাছে ভাল না ; যে স্বভাবের সহিত যে স্বভাব মিলে না, সেই তার কাছে ভাল না ; যার কথার সহিত যার কথা মিলে না, সে-ই তার কাছে ভাল না, যার ব্যথার সহিত যার ব্যথা মিলে না, সে-ই তার কাছে ভাল না ; যার অভাবের সহিত যার অভাব মিলে না, সেই তার কাছে ভাল না ; যার ভাবের সহিত যার ভাব মিলে না, সে-ই তার কাছে ভাল না ; যার কর্ম্মের সহিত যার কর্ম্ম মিলে না, সে-ই তার কাছে ভাল না ; যার সহিত যার মত বিরুদ্ধ সে-ই তার কাছে ভাল না ; যার সহিত যার মন মিশে না, সে-ই তার কাছে ভাল না ; উচিত বিষয় যে বল্‌তে চায়, সে-ই কারো কাছে ভাল না ; সত্য কথা যে বল্‌তে চায় ; সে-ই কারো কাছে ভাল না; সাধুর কাছে চোর ভাল না ; চোরের কাছে সাধু ভাল না ; কপট হৃদয়ের কাছে সরলতা ভাল না; চাতক বুঝে পূর্ণিমা ভাল না–এই সকল "ভাল না" হ'তেই তো সৃষ্টি লীলার আরম্ভ, এই সকল বৈষম্য হইতেই লীলার স্থায়িত্ব, এই সকল বৈষম্যই লীলার প্রত্যঙ্গ, এত কলহ, এত কলরব, এত হুহুঙ্কার, এত কর্ম্ম, এত আয়াস, এত চিন্তা, রাজকর্ম্মচারীদের এত আফিস, এত আইন, এত আদালত, এত সালিসী মোড়লী, এত জরিপ নক্সা, – এই সকল বেকল ঐ এক "ভাল না" কথাটীরই আন্দোলন বৈ তো না! তুমি কারে ভাল বল? তোমরা কারে ভাল বল? তোমাদের মত যে, কিম্বা তোমার মত যে-তোমরা যেমন তা'দিগকে বল, তুমি যেমন তা'কে বল,–তারা এবং সেও তোমাদিগকে ক'য়ে থাকে। এই আন্দোলনেরই অপর নাম লীলা রহস্য।

পণ্ডিত কোন্ গুণে পণ্ডিত, কোন্ শাস্ত্রে পণ্ডিত, কোন্ বুদ্ধিতে পণ্ডিত ; বিদ্বান, তুমি কোন্ বিদ্যায় বিদ্বান্ ; বাবু তোমার কোন পুঁজিতে এত বাহার, – বুঝতে পেরেছ কি?–দেখ্‌তে পাও কি, জান্‌তে পার কি, বিদ্যা বৃদ্ধি কাহাকে বলে?

কলুর বলদ ঘানি টানে আর ঘত্ ঘত্ শব্দ হয়, তার ভাগ্যে কেবল ভূষি, কাজের বেলায় চক্ষে ঠুলি, কাঁধে বিষম বোঝা, চলিতে চলিতে মনে করে যে কত পথ চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মানুষে দেখে সে কেবল ঐ চক্রের ভিতরেই ঘুরে। তোমারাও মানুষ, আমরাও মানুষ, আর ঐ পাগলটাও মানুষ,–বলি, তোমাদের বেলায় এত গাম্ভীর্য্য, আর পাগলটার বেলায় হাসি কেন? তোমরা কি তার চেয়ে কিছু বেশী বুঝ? একথাটা মনে করাও তোমাদের ভুল, নৈলে অহঙ্কার, না হয়ত পাগ্‌লামী। ভাল মানুষ তোমরা, পাগলের মুখের দিকে চেয়ে গাম্ভীর্য্য হারাও কেন? তার স্বভাব দেখ্‌তে পেয়ে তোমরা পাগল সাজ কেন? তোমরা মনে কর–তোমরা যা কর, তা কাজের কাজ, আর পাগল যা করে তা বাজে কাজ। কি কর্ম্ম, অ আর কি অকর্ম্ম,–তা কখন বুঝ্‌তে পেরেছে কি? কর্ম্ম, কাহাকে বলে, কর্ম্মের কারণ কি,–হিসাব করে দেখেছ কি? হিসাব করে বলিয়া, হিসাবের ঘরে

থাকে বলিয়া–সে পাগল, আর বে হিসাবে তোমরা কিনা ভাল মানুষ!

ইত্যবসরে বাবুদের আরও কত জাঁকজমক গল্প তীরবেগে ছুটিয়াছে, সবাই মাতোয়ারা, –এমন সময় অন্দর মহল হইতে "ওমাগো! কই গো! গেছি গো! খাইছে গো!" প্রভৃতি ভদ্রতাবিরুদ্ধ স্বাভাবিক ভাষা অভিধান ব্যাকরণ ছাড়া আত্মিক ভাষা, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইয়া বৈঠকী ঝাড়ের আলোক নিবাইয়া দিল। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে, কি হ'ল? কি? কি?– শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। জানা গেল–গ্রাম্য দেবতা হরিশ বাবুর প্রাণপ্রিয়তম একমাত্র পুত্র সাত বৎসরের দীনেশ, ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের পুত্র সুরেশ দু'জনে জলে ডুবে মারা গেছে। কোলাহল! কোলাহল!-তখন অন্দর মহলে চিকের আড়ালে যাদের মুখ থাকিত, দাসদাসী যাদের গায়ের ধূলা ঝেড়ে দিত, তাদের আর সে অবস্থা নাই, –উলঙ্গিনী, ধুল্যবলুণ্ঠিতা, আলুয়ায়িতা কেশা, উন্মাদিনী। বাবুর বাবুয়ানার বাহার, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নকল করা গিল্‌টিসাজ, সব ধা ক'রে উড়ে গেল। পাগল দেখে সব মানুষ পাগল হ'য়ে গেছে। তখন আর কাব্য নাই, কবিতা নাই, ভাষাতে অলঙ্কার নাই, ব্যাকরণের দোষ নাই, অভিধানের আবশ্যক নাই, এক বে-লয় রাগিণী লয় ধরিয়া স্পষ্ট আত্মিক সুরে পাগলের তাল মান ছাড়া রাগিণীর ঝাঁজে মিশিয়া গেছে। পাগল একবার হে'সে উঠ্‌ল, "হায় রে! মানুষ"–ব'লে আবার কেঁদে উঠ্‌ল। এ হাসি-কান্নার অর্থ এ বিশ্ব গ্রন্থের এই পৃষ্ঠায় নাই, থাকিলে অপর পৃষ্ঠায়। পাগল লীলরহস্যে মন মাতাইয়া আপন্ মনে তান্ ধরিয়া তখন গাহিতে লাগিল!–

আজব দুনিয়া ভাই বড় তামাসা,
এই দেখি, এই নাই হ'য়ে যায় সকল ভরসা!
আশমানে বানা'য়ে ঘর, তার ভিতরে বাসা,
যা'র লাগিয়ে খেটে মর, সেই কর্ম্মনাশা।
ভুলাইতে কামিনীর মন, দিছ ভালবাসা;–
আসবে শমন, বাঁধবে যখন, বুঝবি মাগীর নিশা।
একদিন যে তোর লইতে হ'বে গাঙ্গের কুলে বাসা
হর্‌দমে জাগাইও দিলে, আর হবে না আসা।
দীন হীন মনমোহন কয় করিয়ে খোলাসা,
দুই চক্ষু বুজিয়া গেলে সম্পর্ক নাই রতি মাষা।

গাহিতে গাহিতে, এই তানে পাগল ছুটিয়া চলিল এ দেশ সে দেশ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বৎসরান্তে আবার পূজার ছুটির পর বাবুর বৈঠক খানার আসর দেখিবে বলিয়া সেখানে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, গিয়ে শুনিল,–বাবু গৃহশূন্য হইয়াছেন, নব পরিণয়ের উদ্যোগে ব্যতিব্যস্ত, আবার সেই হাসিমুখ।–ভাবিল

মানুষ কি করে, ও কি করে, কি নিয়া কি রে, কি দিয়া কি করে, কার জন্য কি করে?–একটু আনন্দ। বলি, হে! প্রণয় বিধুর নব বিবাহার্থী যুবক, গৃহিণী তোমার কে? না,–একটু আনন্দ, নব প্রণয়িনীর স্বামী কে? না, একটু আনন্দ ; নব প্রসূতির সন্তান কে?– না, একটু আনন্দ ; তোড়া ভরা টাকা কি?–না, একটু আনন্দ, দালান কোঠা গড়ে কেন?–না, একটু আনন্দ ; জমিদারী করে কেন?–না, একটা আনন্দ ; বন্ধুতার অর্থ কি?–না, একটা আনন্দ ; জাঁকজমকের হেতু কি? –না, একটু আনন্দ ; বলি, সর্ব্বদা দেখিতে পাই কুসুমে কন্টক আছে, চাঁদে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কাঁটা আছে, চন্দন গাছে সাপ বেড়িয়া থাকে ; আর প্রভাতের সন্ধ্যা, সন্ধ্যার প্রভাত আছে ; জন্মের জরামৃত্যু আছে, জলধরে বজ্র আছে, পাহাড়ে সিংহ আছে, বেগুন গাছে কাঁটা আছে, ফুলের মধুতে আঁঠা আছে, আজকে কলি, কাল হয়তঃ ফুল্লহাসি, পরদিন হয়তঃ ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে,–বলি, দেখেও দেখি না কেন, শুনেও শুনি না কেন, বুঝেও বুঝি না কেন" আজ যাহাকে প্রিয়তম বন্ধুভাবে প্রাণের কথা খুলিয়া দিয়া সাধ মিটাইতেছি, কাল হয়ত রোষকষায়িতলোচনে তার মস্তক ছিন্ন করিবার আয়োজন দেখিতেছি,–প্রাতে এক রকম, সন্ধ্যায় এক রকম,–আজ এক রকম, কাল এক রকম-মূহুর্ত্তে মূহুর্ত্তে, পলকে পলকে যার পরিবর্ত্তন, তার মধ্যে সর্বসাকল্যে সুদে আসলে টুক্‌রা আধটুকরা দ্বন্দ্বপ্রীতিতে আনন্দের ভাগ পাইব বলিয়া কেবল মাতোয়ারা! পশ্চাৎ পশ্চাতের স্মৃতি ; সম্মুখে, সম্মুখের আলেখ্য–কেবল ঐ মাত্‌লামীতে আত্মহারা! তাইত আজ এক রকম, কাল এক রকম ; তাইত বাবুর গত আসরে আলেখ্য, আর অদ্যকার আসরের আলেখ্য, সেই বাবুয়ানা, সেই উদ্মাদনা, আবার সেই মুখের হাসি, –বলিহারি, তাদের হৃদয়ের দাগগুলা রঙ্গের পর রঙ্গ্ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া তারা হাসে, আর পাগলের হৃদয়ের দাগটা আরও বেশি রকম দাগ চড়াইতে গিয়া হাসে। তাদের হৃদয়ের দাগটা রং উঠিয়া ভাসিয়া পড়িলে, তারা কাঁদে ; আর পাগলের হৃদয়ের দাগটা মুছিয়া যাইবে বলিয়া সে কাঁদে। বলি, এ হাসি, আর সে হাসি, এ কান্না, আর সে কান্না বিচার ক'রে ক'জন আছে! কেবল এ সংসারেরই ধামাল খেলায়, আমি পাগল, আর তারা ভাল মানুষ,–এই দুই কথাই ঠিক রহিয়া গেল। পরের কথা ভাবিয়া ফল কি! ঐ দেখ ফুল ফুট্‌ছে, ভ্রমর আস্‌ছে, হাওয়া খেল্‌ছে, পাতা নড়ছে, পাখী উড়ছে–আকাশটা আকাশের মত, আর মাটীটা মাটীর মত, হাওয়াটা হাওয়ার মত, টাকাটা টাকার মত, সিকিটা সিকির মত, যে যার মত, সে তার মত,–এক মত হ'তে গেলেই পরিসমাপ্তি, শান্তি ; আর বহু মতে–সংগ্রাম, সংগ্রাম,–সংগ্রাম ; পাগল চায় শান্তি। সবে বল–শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!



অবিবেকতা

যার আরম্ভ আছে, তার শেষও আছে; যার আদি আছে, তার অন্তও আছে, যার উজান আছে ; তার ভাটীও আছে ; যার আনন্দ আছে, তার নিরানন্দও আছে ; যার হাসি আছে তার কান্নাও আছে ; যার আড়ম্বর আছে, তার নীরবও আছে ; বাঁশী বাজে, আবার নীরব হয় পাখী ডাকে, আবার চুপ্ ক'রে ব'সে থাকে ; এই বৃষ শিং দিয়া মাটী তুলে, এই আর নড়েনা চড়ে না; এই শোঁ শোঁ করিয়া গাছ ভাঙ্গে, পালা ভাঙ্গে, এই আর গাছের পাতাটীও নড়ে না ; এই শীতের থর্‌থরি কম্প, এই আর গায়ে কাপড় রাখা যায় না ; এই আলো, এই অন্ধকার ; এই সুখ, এই দুঃখ ; এই কোলাহল, আর এই নীরব। ইহাতে উহাতে, এ কথাতে সে কথাতে, এইভাবে সেইভাবে কেবল কতকগুলা ঢেউ উঠ্‌ছে, ছুট্‌ছে, রঙ্গ কর্‌ছে, আর পড়ছে। কই সে মহাবীর! যার হৃদয় এ তরঙ্গে কাঁপে না, এই ঢেউয়ে নাচে না, এই উচ্ছাসে মাতে না, এই প্রহসনে হাসে না, এই রাগিণীতে কাঁদে না।

নেশাখোর নেশা খায়, বদ্‌মায়েস পরনারীর আসক্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাটী উজানে, আশার টানে, দূরাশায় নিরাশাদগ্ধ প্রাণ আকুলি বিকুলি করিয়া আথাল পাথাল ভবনদীর অকুল তরঙ্গে কেবল ফাঁকি দিতে গিয়া ফাঁকিতে প'ড়ে যায়, ভুলাইতে গিয়া ভুলে যায়, কে জানে তার আগে পাছে কি?

অচেনা অজানা, পার নাই, কুল নাই, এমন যে দেশে গতি, এত বড় একটা সরল রেখা আগে আর অত বড় একটা দাগ পাছে, যার যার সুখের ভাগী সে ; কষ্টের ভাগী, অনুতাপের ভাগী, কলঙ্কের ভাগী, যার যার সেই হয় এবং হইতেছে ; বরং সুখের আলোককণা ছড়াইয়া দিয়া একে আরে অনুভূতি করিবার, সহানভূতি পাইবার অনেক সুযোগই ঘটে ; কিন্তু দুঃখের একটু খানিও কাহাকে দিয়া বিরাম পাইবার, শান্তি পাইবার কারণ নাই। বলি, চোখ্ ভরা এত বড় একটা পট সম্মুখে, তবু কেন ইয়ত্তাহীন, সমাপ্তিহীন রাজ্যের দিকে ব্যাকুলগতি-এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

ধনী লাখের উপর দশ লাখ জমাইতেই ব্যস্ত, এবং দারিদ্রের নিপীড়ন করিয়া আড়ম্বর সুখে মতোয়ারা,– সে এত খুঁজিবার অবসর পাই কই?

গৃহিণী–মাছ, দুধ, চাউল, তরকারী, গয়নাপত্র, কাপড় চোপড়, অন্যদিকে স্বামীর মন নিয়াই ব্যস্ত– সে আর খুঁজিবে কখন? বিদ্যাদিগ্‌গজ উকিল মহাশয় শঠতা চাতুরী ও আইনের পাছে পাছে উকালতিতে, মোক্তার মোক্তারিতে, বিচারক পদগৌরবে ও বিচারে, মানী আত্ম অভিমানে, কেরাণী প্রভুর কাজে, চাকুরাণী বাসন মাজায়, নাবিক নৌ-চালনে, সহিস ঘোড়া দৌড়াতে, যুবক যুবতীর আলেখ্য খানি মনোমাঝে লুকাইয়া, গায়ক সুরতরঙ্গে, নর্ত্তকী অঙ্গভঙ্গিতে, ছেলেগুলা ধাবন-কুর্দ্দনে, মেয়েগুলা পুতুল খেলায়, কেবল হেলায় হেলায় দিনের দিন কোথায় জানি ছু'টে যে'তেছে,–কাজের ভিড়ে আর কারো লক্ষ্য নাই ; –নব পল্লব পশ্চাতের পত্রগুলির দিকে আর চাহিয়া দেখে না, ফুটন্ত ফুল কাল্‌কের ফুলটির দিকে ফিরে চায় না, কি যেন কিভাবে প'ড়ে কেবল কি যেন কি নিয়ে, কি ক'রে বেড়ায়; –ভাবুক আগা-গোড়া দেখ্‌তে যেয়ে, কুল ছেড়ে কুল পাবে বলে আকুলের ঘাত প্রতিঘাত জনিত নাদে, প্রকৃতির বিশ্বজোড়াকলরবে অনাহত, অস্ফুট পরমারাধ্য বীজকে নিজ হৃদয়ে ধরিতে যাইয়া লোকসমাজে পাগল হ'য়ে যায়, আর মানুষগুলা তাকে বকাবকি করে, আর ঠেলে ফেলে দিতে চায় ; তাই পাগল লোকালয় অপেক্ষা গাছতলা ভালবাসে, আর কখন কাঁদে কণ হাসে, পথিক জিজ্ঞাসা করে-পাগল হাস কেন? পাগল কয় শোন্‌, শোন্‌, শোন্‌, কেন হাসি–বলি শোন্–

এক ইন্দুর আর এক সর্প দু'জনে এক জায়গায় অনেক দিন থেকে পরস্পর বন্ধুতা বন্ধনে আবদ্ধ হইল। একদিন দুই বন্ধু ভ্রমণ উপলক্ষে রওয়ানা হইয়া চলিয়াছে-ইন্দুর আগে সর্প পশ্চাতে। সর্প ইন্দুরের সঙ্গে যাইতে না পারিয়া ডাকিয়া বলিল–বন্ধুবর! একটু দাঁড়ও। ইন্দুর কয়-আমার একটা কথা রাখিলে দাঁড়াতে পারি।

সর্প-কি কথা।

ইন্দুর-তুমি চলিবার সময় বড় বেকা হইয়া চল, সিধা ভাবে চলিলে সঙ্গে এ'স, আমি দাঁড়াতে পারি।

সর্প–এই আমি সিধা হইয়া চলিলাম, তুমি দাঁড়াও। অমনি উভয়ে দৌড়িল ; কিন্তু সাপ চলিতেই বেকা, কিছুতেই সিধা হইতে পারে না। ইন্দুরও তার বক্রগতিতে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতে না পারিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিল। কাজেই সাপ আবার বন্ধো! বন্ধো! বলিয়া বন্ধুকে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিল। যতবারই এইরূপ ইন্দুরকে সম্ভাষণ করিল, তত বারই বুদ্ধিমান মূষিক কেবল পূর্বোক্ত প্রশ্ন জালে জড়াইয়া পুনঃ পুনঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিয়ৎ পরে ফণীরাজ স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বন্ধুবরকে জীবনের মত শিক্ষা দিবে বলিয়া অতি দ্রুত ছুটিল। মূষিক অতি বেগতিক দেখিয়া সরুমুখ গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। স্থূলকায় ভুজঙ্গ কিছুতেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে ফণা ধরিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। এ দিকে রাখালেরা মাটে গরু চরাইতেছে ; ফণীরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া লগুড়াঘাতে অহঙ্কারের সহিত জীবনের লীলা শেষ করিয়া, রাস্তায় লম্বা করিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মূষিক কতক্ষণ পরে বন্ধুবরের অন্বেষণে আসিয়া দেখে-বল দর্পিত ফণীরাজ আর নড়ে না চড়ে না, লম্বা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শেষ শয্যা বুঝিতে পারিয়া, বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়া কয়-হায়, বন্ধো! এখন ত সিধা হ'য়েছ, কিন্তু আগে যে এত বুঝাইলাম, এত প্রবোধ দিলাম, তুমি বুঝিলে না, সিধাও হইলে না। থাক্‌তে যদি সিধা হইতে, তবে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত।

এই রকম পাগলের কথা, পাগলের গীত মানুষে একদিন বুঝে। কবে বুঝে?– যে দিন সরিষাতে তৈল থাকে না, যেদিন দুগ্ধে মাখন থাকে না, যে দিন প্রদীপটি নিব নিব হয়, যে দিন লাঙ্গলে মাটি খায়, যে দিন ঊষার হাসি প্রদোষে লুকায়, যে দিন পূর্ণিমার হাসি অমায় লুকায়–সেই দিন একবার সেই তান বাজিয়া বাজিয়া উঠে,–পাগলের কান্নার সুরে সুর মিশাইয়া, এদিন ওদিক ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, প্রাণের ভিতর কেবল একটী ধ্বনি রয়ে যায়–হায়! হায়!! হায়!!! শোন্‌, শোন্‌, শোন্‌, এ পাগল গায় ;–

পায় ধরে কই–গুরু ভজ, যাইও না মন কুপথে।
সোজা রাস্তায় চল রে ভাই, ভবের বোঝা নিয়ে মাথে ॥
কন্টকে বাড়ায়ে পাও, দুঃখ পে'ওনা, মাথা খাও।
আনন্দে হরিগুণ গাও, কেউ যাবে না কার সাথে॥
আসবে শমন বাঁধবে ও মন,শুনবে না কা'র বিনয় বারণ ॥
হুঁসে থেকে–কয় মনমোহন, ধরে চরণ যোড় হাতে॥



আমি কে

আসিয়াছি কোথা হ'তে আমি, যাব কোথায়! আমি ক'দিন হ'তে 'আমি' বলিতে শিখিয়াছি, কোথা হ'তে শিখিলাম, কে শিখাল?

এই যে একটা দেহ, নাক, কান, চোখ, মুখ, কত কিছু রূপের গড়া, কোথা হ'তে আসি ভাবের ফোয়ারা লাগে, আমি একটা কি যেন কি তার মধ্যে,–কি জানি কি পাব ব'লে, ধর্‌ব ব'লে, করব ব'লে, হব ব'লে, উজান ভাটী সে তরঙ্গে কখন হাসি, কখন কাঁদি, কখন নাচি, কখনই লোই,– এ খেলার আরম্ভ কোথা হ'তে–শেষ কোথায়–বলি, কে আমি ?

মন, মন, মন,–মনটা কি? ধরা ত যায় না, দেখা ত যায় না,–যেমন হাওয়ার একটা রেখা, আলোকের একটা রশ্মি, জলের একটা ঢেউ, আঁধারে একটা ঝিকিমিকি, রোদের একটা ঝাঁ ঝাঁ–এইটা কি? থাকে কই? খেলে কোথা হ'তে? এত বড় বিদ্যাবুদ্ধিপূর্ণ প্রকাণ্ড কাণ্ড দেহটা ঐ মনটার ঘাত প্রতিঘাতে উতরোল, উদাসী সন্ন্যাসী, গৃহবাসী পাগল! বলি, ওটা কি? কখন হাসায়, কখন কাঁদায়, কখন আবার কই নিয়ে যায়–এই দিগন্তে ছুটিয়া গেল, এই সেখানে চুপি দিল ; এই রাজা, এই কাঙ্গাল, কেবল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গে আর গড়ে,–আর বেড়ায়। আঁধারে সে চোখে দেখে, পাহাড় সে লঙ্ঘিয়া যায়, সাগর পার হ'তে তার জাহাজ লাগে না, ঝড় বাদল তার গায় ঠেকে না; রেলগাড়ী তার পাছে পড়ে থাকে, ইমারত্ সে মুহূর্ত্তে গড়ায়, আবার সেই মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চুরে বোম্ হ'য়ে থাকে!

তার কতকগুলি মুহরি আছে, আদালত ফৌজদারী আছে, বাজার আছে, আর কতকগুলি হিসাব নিকাশ আছে ; কিন্তু অভিধান ব্যাকারনের বড় ধার ধারে না : স্মৃতি শ্রুতি কেবল তার বাহির বাড়ীর দু'টো কথা ; তার মুহরিরা উল্টা পাল্টা জমা খরচ লেখে; তার বিচার আফিসে কত নিরপরাধীকে কসে কসে বেত মারে, জেল দেয় ; তার বাজারে হীরা মাণিক কেবল কথার মূল্যে বিকি যায় ; হাটে ঘাটে মাঠে, নদীর তটে, চিত্রপটে, সাধুর ঘটে ঘটে কেবল তার ঐ লীলা, তার ঐ খেলা।

দেখ, এত সে সাজ, এত যে পরিপাট্য, এত যে সুচিকণ কারুকার্য্য–এ সকলের মূলে একবার ভেবে দেখ!–ঘর সাজায়, না মন সাজায়? ও সকল জড় পদার্থ, যেমনি আছে, তেম্‌নি থাকতে তাদের কোন আপত্তি নাই ; তারা কারুরে বলে না–আমায় এমন কর, বা তেমন কর, পাহাড় কেটে নদী গড়, নদীর বুকে পাহাড় গড়। –কেবল ঐ বেটার সব ইঙ্গিতে সঙ্কেতে, ইশারায় এত তোলপাড় হচ্ছে।

ভাল দেখায় না,–কে বলে? ঘরত বলে না ; আল্‌মারি ত বলে না, পুঁথির মলাট ত বলে না ; তারপুরের লাউ ত বলে না, হুক্কার নল ত বলে না–তবে তাদের উপর এত ঝিকিমিকি কেন? লতার নকল লতা, পাতার নকল পাতা, মাথার নকল মাথা, ইহার নকল উহা, উহার নকল ইহা,–কে গড়ে? কেন গড়ে?

মন আর একটী তার ইচ্ছা–এই এক জোড়া মানুষে এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটা কখন হা ক'রে গিলে ফেলে, কখন উগারিয়া দেয়, কখন ধা ক'রে ভেঙ্গে ফেলে, কখন আবার গড়িয়া লয়। হা!–কি ব্যাপার? কি কাণ্ড! কেবল লণ্ডভণ্ড ব্রহ্ম অণ্ড এ অকুল তরঙ্গে কখন ডুবে, কখন হাসে-তা দেখে পাগল নাচে আর গায়,–হায়! হায়!! হায়!!!–এ আলোড়নের, এ বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলা কই? এ কোলাহলের শান্তি কই? এ প্রবাহের শেষ কৈ? কে বলিবে-কৈ? কে জানে– তা কৈ? চাঁদ হাঁসে, ফুল ফুটে, ধূলা উড়ে, পাখী গায়,–এ রহস্যের পরিসমাপ্তি কই? জেলখানা ভরা কয়েদী, হাসপাতাল ভরা রোগী, পাঠশালা ভরা ছাত্র, বাজার ভরা দোকানদার, শহর ভরা ধনী মানী–সকলেই ঐ এক জোড়া মানুষের খেলার পুতুল। তার সোহাগ ভরা চঞ্চল আঁখি ঠারে, কমনীয় অঙ্গুলীর উষ্ণ ইসারায় ব্রহ্মাণ্ডটা কেবল দোলে দোলে দোল খেলায়; স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা মাতা, –এই যে একটা বাসা বাড়ীর আশা গড়া বন্ধন, তার ভিতরেও কেবল ঐ দুটারই যত সব লীলা খেলা। পাগল গায় ; –হায়! হায়! হায়!!! ঐ শোন্ শোন্ শোন্–পাগল গায় ;–

মানুষ করে না কর্ম্ম, শুধু, ভাবে করে খেলা,
ভাবাভাবে লেগে দ্বন্দ্ব, পাগল বানায় মানুষগুলা।

বম্ ভোলানাথ! তবে তুমি আমি কেউ কিছুই নই?–ধনের বড়াই, মানের বড়াই, যশের বড়াই, কারো গায় কিছু লাগা থাকে না, লাগে না। কে করে?

কে গায়? কে চায়?–বম্ ভোলানাথ! ঐ দেখ আতস বাজী, বারুদে আগুন লেগে আকাশের গায় কত ছবি আলো ক'রে বানা'য়ে, ধা করে অগ্নি সব আঁধারে ডুবিয়া গেল,–হায়! হায়! হায়!–সব ত এমন, সব ত তেমন–কেউ কিছু নয়!

অনলে অনিলে পাতিয়ে খেলা,

ধূ ধূ করি দেয় হৃদয়ে জ্বালা।

'আমি' কথা কে শিখা'ল যার আদি নাই; অন্ত নাই, মূল নাই? ও কথাটা কোত্থেকে এল? কে এনে জড়া'য়ে দিল?–হায়! হায়!! হায়!!!

এক চাবুক্‌ছে দুনিয়া লটপট হ্যায়। ভাবিয়া দেখ ভাবুক সুজন–কোন পুস্তকের হরপ এইটী?–কোন গগনের তারা এইটী?–কোন নদীর ঢেউ এইটী?–কোন আলোকের রেখা এইটী? বলি! সে কে, আর আমি কে? কোথা হ'তে এলাম, কোথা যাই, কি করি;–কে জানে-কি করি। কে শুনে? কে বুঝে? কে সম্‌ঝে?–কই সে জন? আমিত কেবল ফুল বাগিচার রঙ্গ দেখি, তার রঙ্গের ঢং লাগাইয়া কখন কাঁদি, কখন হাসি।

একদিন এক তামাসা দেখিলাম।–একটা ফুল এদিক ওদিক মাথা নেড়ে নড়তেছিল। সাধ করে তার কাছে গেলাম, আদর ক'রে চুমু দিয়ে বুকে লয়ে–কি কথা কয়, শুনতে চাইলাম। অম্‌নি তার ভিতরে-আমার ভিতরে তারহীন টেলিগ্রামে টকাটক্ ঠকাঠক্ বাজিয়া উঠিল, ফুল নাকি খুঁজতেছিল–ফল কৈ? অম্‌নি ফল উঁকি দিয়ে ক'য়ে উঠল–আমি কি আর তোমায় ছাড়া! বল দেখি–আমি কে, আর সে কে!

উঃ! প্রাণ জুড়াল।



কারণ কি

খোকার অসুখ হ'য়েছে।–কারণ কি? হরিদাসী বে'র হয়ে গেল,–কারণ কি? রাম শ্যামার মাথা ফাটাইল,–কারণ কি? কালীদাস সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল,–কারণ, কি? কামিনী পাগল হ'য়ে পড়ল, কারণ কি? মহামড়কে দেশ উৎসন্ন গেল,–কারণ কি? ঝড়ে দালান কোঠা ভেঙ্গে দিল–কারণ কি? কেবল প্রত্যেক কার্য্যটীর পাছে আমরা কারণ তালাস করিয়া ফিরি–উহা, মানুষ আমরা, আমাদের একটা নিতান্ত গড়াপেটা স্বভাব বটে।

যে কোন কার্য্যের একটী কারণ তালাস করে বে'র করতে পারলেই হয়ত আমাদের কোথাও দুঃখরাশি উছলিয়া উঠে, কোথাও বা হয়ত আনন্দের ফোয়ারা ছুটে, আর কিনা, ইহা উহা করিয়া খুব গলাবাজী করিতে পারি, আর যেখানে আমাদের বুদ্ধিটুকু হার মানে সেখানে অজানা অচেনা কি না কি একটা অলৌকিক শক্তির দোহাই দিয়া বসি। বলি, এ জগতখানা দেখ। বাঁশী কি আপনি বাজে, ঢেউ কি আপনি উঠে? কি বাজায়? কে তুলে?–সে কে? ইহা কারণ, উহা কারণ–কেবল কার্য্যটীর পরখানা দেখ,–এই কারণ তরঙ্গ কোন্‌খানে বাতাস লাগিয়া উথলিয়াছে, কোন্ ঢেউয়ে এই ঢেউয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া লাগিয়াছে, তাহা দেখ কি? শোন্ শোন্ শোন্ ঐ শোন্–পাগল গায় ;

কোথা হ'তে আসি ভাসি লাগে ঢেউ,

পরপারে তার আছে নাকি কেউ,

নৈলে এমন করে, হৃদয় ভিতরে হাসায়ে কাঁদায়ে যায়।



তা'র পর কি

এই কথা কি কেউ বল্‌তে পার– তার পর কি? বুঝায়ে দিতে পার-তার পর কি? ভাবনার আগাগোড়ায় কেবল '"তার পর, তার পর" করেই তর্‌ তর্‌ তর্‌ মানবতরী অকুল ভবতরঙ্গে ভে'সে বেড়াচ্ছে। আমার মত মোটা বুদ্ধি কারোর থাক্‌লে, অম্‌নি পাঠশালার ছেলেদের ন্যায় ধা ক'রে বলে ফেল্‌বে- তারপর আবার কি? প্রভাতের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর প্রভাত অমার পর পূর্ণিমা; পূর্ণিমার পর অমা ভালোর পর মন্দ, মন্দের পর ভাল; জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম। বলি,-ম্যাদের পর খালাস-তারপর কি? তারপর আবার ম্যাদে যে'তে হুকুম দিয়ে বস্‌বে না ত? তোমার মন্তব্যে, বিচারে, বর্ণনায় দেখছি তাই হ'য়ে পড়ে। এখন বলত বাপু-তারপর কি?

জোয়ারের পর ভাটা, ভাটার পর জোয়ার ; আহারের পর ক্ষুধা, ক্ষুধার পর আহার ; নিদ্রার পর জাগা, জাগার পর আবার নিদ্রা। বলি-পৃথিবীর পর আকাশ, আকাশের পর কি আবার পৃথিবী?-না হ'লে, তার পর কি?

জন্মের পর চুড়াকরণ, বিবাহ, তার পর পিতামাতা হওয়া। ভেবে দেখ দেখি, তার পর কে তুমি, কি হবে, কি হ'ল তার পর-কে জানে? জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম-তোমার এই মোটা মোটা কথা মানতে গেলে, ফাঁসীর পর আবার ফাঁসী হ'বার কথা। বলি,-তারপর, তারপর কিছু আছে কি না?

এই একটি কথার পর, একটী ঘটনার পর, একটি হাসির পর, একটি ভাবের পর, আজকের সন্ধ্যার পর দু'বছর দশ বছর পর, পর পর এসে- তার পর কি?

'তার পর, তার পর' ক'রে সর্ব্বব্যাপী কালকে সরা'য়ে সরা'য়ে চলে যাওয়া হচ্ছে। বলি-সকলের পর কি?

ডারইন ব'লে গেছে, ইহার পর উহা-যেমন, বানরের পর গরিলা, গরিলার পর বন মানুষ; বন মানুষের পর মানুষ, মানুষের পর কি?-এই

কিন্তু ফাঁক পড়ে গেল!

দেখ সাধারণে কয়্‌-মৃত্যুর পর কাহারও নরক, কাহারও বা স্বর্গ; স্বর্গের পর নরক, নরকের পর স্বর্গ। বলি-তার পর কি?

যাহা কিছু দেখ, সবগুলা ভাব্যভাবনার বিষয়। কেবল তোমাদের মন্তব্যে যেই সেই হ'য়ে গড়াগড়ি খায়। তার পর, তার পর কে, ইহা যদি বুঝ, তবে একবার গড়াগড়ি ঢলাঢলির দিকে না যে'য়ে-তার পর কি, তার পর কি কি, ব'লে ছুটে এগিয়ে চল,- তার পর যেতে যেতে পরাৎপর তৎসৎ কারণে "তার পর" মিশিয়ে- পর পর হ'তে হ'তে নাহি আছে যার পর, তার খবর পেয়ে পাগল হ'য়ে নেচে উঠ্‌বে।

বলি! তারপর কি?

নিরুত্তর

অপ্রাপ্য মনসাসহ ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে।



দশটা বেলা

ঢং ঢং করে ঘড়িতে বেলা দশটা বেজে গেল, কারোর কোনও কাজ বাকী আছে বলে, কি বাকী র'য়ে গেল বলে আর ফিরেও চাহিল না। এই তার আইনের ধারা মত সেকেন্ডের কাটা টক্ টক্ করিয়া মিনিটে, মিনিটের কাটা ঘন্টাতে যে এসে মিলে গেল, অমনি টং টং-আর দপ্তরীর হাতুড়ির পিটায় ঢং ঢং।

এই ইংরাজের আমলে বর্ত্তমান বাজারে দশটা বেলা বড় হুড়াহুড়ির সময়–এই সময়ে মানুষের মনগুলা বড় বেশী রকম নাচে, আর থক্ থক্ করে; কেন না,–বাবু আফিসে যাবেন দশটা বেজে তা'রে অধীর করে উঠাইল, ছেলে স্কুলে কলেজে যাবে, ঐ দশটা সেখানে তাড়াতাড়ির ভিতর ফেলে দিয়ে একেবারে হেস্ত নেস্ত করে ফেল্‌ল, আর কি, ঘরে ঘরে গৃহিনীদেরও ভারী ব্যস্ততা,–ভাজা হচ্ছে, ব্যঞ্জন হচ্ছে, ঘণ্ট হচ্ছে–স্বামীর অফিস, ছেলের স্কুল কলেজ ভাড়ী তাড়াতাড়ি,–বাস্তবিক এই সময়টা বড় তাড়াতাড়ির সময়। আবার ঐ কতকগুলা মানুষ বড় তাড়াতাড়ি ক'রে ব্যাগ বগলে রাজপথে দৌড়াচ্ছে। ওরা যাবে কোথায়? সকলেই যার যার কাজে চল্‌ছে। ষ্টেশনে গাড়ী আসিবে এখন ঠিক ১১টার সময়, –তাইত রাম সেখানে যাবে, শ্যাম ঐ খানে যাবে, কালী এ দেশ সে দেশ করে ঘুরবে। পাগল ধীরে ধীরে তার পাছে ছুটে গেল। ঐ অদূরে তারের খাম্বা শন্ শন্ করে এখানের খবর সেখানে, সেখানের খবর এখানে নিচ্ছে, আর আন্‌ছে। যেতে যেতে পাগল ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াল। এখনও গাড়ী আসে নাই, সব মানুষগুলো হা করে এ দিক ওদিক নড়ছে চড়ছে। এ কথা সেকথা, এ দেশ সে দেশ, রঙ্গে বদরঙ্গে, কত কথাই চল্‌ছে অমনি গাড়ী আস্‌বার খবর পৌছিল, টিকেটের দরজায় ভারী ভিড় টীকেট বাবু একখানা ছোট দরজা খু'লে ভিতর থে'কে টিকেট দিচ্ছেন। মানুষগুলা জড়াজড়ি করে-পয়সা হাতে লয়ে–ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছে। টিকেট দেওয়া ফুরাল, গড় গড় গড়

গাড়ী আসছে, দৌড়াদৌড়ি ক'রে ঠেলাঠেলি ক'রে যেই গাড়ীখানা থাম্‌ল, অম্‌নি মানুষগুলো উঠে পড়লো টং টং টং বেজে উঠল, ধপাধপ্ আবার গাড়ী ছুটল। পাগল হা করে চেয়ে আছে,–বাবা, একি আজব খেলা!-কেবল তাড়াতাড়ি, কেবল হুড়াহুড়ি, কেবল ঠেলাঠেলি-আর একথা সেকথা, আর আসা যাওয়া, আর পরিচয় অপরিচয়, এ কতকগুলা কারখানা জগৎভরা, বিশ্বভরা, আর যেমন কিছু নয় !–ভাব্‌তে ভাব্‌তে চেয়ে দেখে, গাড়ী আর দেখা যায় না,–কই গেল রে? কি নিয়ে গেল রে?– মালগাড়ীতে নিল কতকগুলা মাটি, আর খেলার পুতুল।–আর নিল কি? কৈ আর কিছু নয়। আর বাকী গুলাতে নিল কি? এবার পাগল নাচিয়া উঠিল,–বা! বা! বেশ মজা! বলিয়া এক হাস্ দিল, কেউ ফিরে চাহিল কিনা সেই জানে, অম্‌নি চুপ। ভাব্‌ল কি নিয়ে গেল্‌রে?–নিবে আবার কি?– মানুষ নিয়ে গেছে। দূরছাই-মানুষ নিল কৈ?–নিল কতটুকু সুখ, নিল কতটুকু দুঃখ, নিল কতটুকু কান্না, নিল কয়টা হাসি, নিল কিছু দোকানদারী, নিল কিছু তালুকদারী, নিল কিছু মামলা মোকদ্দমা, নিল কিছু মুন্সীগিরী, নিল কিছু মিলনের বিরহ, নিল কিছু বিরহের মিলন, নিল কিছু অতৃপ্ত আশা, নিল কতটুকু ভালবাসা, নিল কয়টা চিন্তা, নিল কয়টা মনগড়া কথা। আর নিল কি? আগে একটা শোঁ শোঁা, পাছে একটা শোঁ শোঁ, আর মাঝে একটা চল্‌তি ধামাল। উঃ! ও কিরে? বলি! এত কোলাহল কেন? না–যাই, এদেশে আমার স্থান নাই, নীরব কোথায় পাই,–এই ব'লে পাগল দৌড়িয়া চলিল, কোথায় গেল, কে জানে!



বুড়ো মর্‌লে ক্ষতি কি

বাড়ীতে বড় ভিড়,–রামার মা, শ্যামার মা, চৈতার মা, নিতার মা, কালীর মা, দুর্গার মা, কামিনী, যামিনী, বড় খোকা, ছোট খোকা-ভারী গুল্‌জার আসর। তার ভিতরে উপন্যাসের নায়িকা বুড়ো ঠান্‌দিদি দু'এক জনারও অভাব নাই। কেহ তাম্বুলে, কেহ তামাকে, কেহ হাসিতে, কেহ খুশিতে, একথা সে কথা কত কথার আন্দোলন চল্‌ছে ;– অমুকের বউ ভাল না, অমুকের জামাই ভাল না, গোপালের মা ভাগ্যবতী, ভাল মানুষ,-আবার কেউ তার সে কথার প্রতিবাদ ক'রে কত দোষ দেখা'য়ে দিতেছে; তার ভিতর অমুকের স্বামী চাকরী বিষয় করে না–কেবল হরিবোল্, হরিবোল্ করে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, বাড়ীতেও বড় আসেনা। – কেউ বল্‌তেছে ঘরে উপযুক্তা সুন্দরী বউ, তা'র দিকে ফিরেও চায় না-ওটা মানুষ না, ওর ভাল হবে না ইত্যাদি কথার পর বুড়ো মান্‌সের কথা। নাতিনী কয়,–'দিদি তুই মর, বুড়ো মানুষ বেঁচে ফল কি?' পাগলটা আড়াল থেকে সব রহস্য দেখ্‌তেছিল, শুনতেছিল, আর ভাবতেছিল,–ভাল বুড়ো মানুষ বেঁচে ফল কি?

ইতিমধ্যে বড় খোকাকে মা রাগ করে বল্‌লেন-তুই মর্। অম্‌নি বুড়ো দিদি ষাট্ ষাট্ করে গালি দিলেন। বলিহারি-একি-কে? না? বুড়ো মরলে ক্ষতি নাই,–যেহেতু, তা হ'তে আর কোন আশা প্রত্যাশা নাই, তাহার খাটিবার সময় নাই, তাহাকে খাটান যাইবে না,–তা হ'তে কোনও বাসনা পূর্ণ হইবেনা,–কাজেই তাহার মরিলে ক্ষতি নাই।

লাভ আর ক্ষতি এই নিয়াই হিসাব নিকাশ, বিচার আন্দোলন, আলোচনা গবেষণা, মারামারি হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি। সকল কোলাহলের মূল অর্থ, মূল বিষয়-লাভ আর ক্ষতি।

বুড়োটা ক্ষতি করিতেছে–কেবল বৃথা অন্ন ধ্বংস; তাই আর অপরের মনে ভাল লাগিতেছে না, স্ত্রী সেবা করিবে বলিয়া বিরক্ত হইতেছে, পুত্র

কন্যা কেন যেন বুড়োকে বড় ভাল বাসে না–কথায় কথায় শ্রাদ্ধের আয়োজন চলে। চিন্তা করে বাপের শ্রাদ্ধ নিজের বেলায় কি হ'বে, তা ভেবে দেখে না, কেবল দেখে হদ্দ মজা,-হায়রে হায়!

'যত কাল রস তত কাল খোদা বশ,
গেলে রস ফুরাইয়া,
নাম হয় খোদা বইয়া।'

হারে-পাগল তাই দেখে, ভেবেইত পাগল হ'য়ে গেছে। বুড়োকে বিদায় যুবককে সম্ভাষণ–এই ভবের খেলা। যুবক কর্ম্মে মজবুত, খাটিতে পারিবে, খাটিবে, তাই তাহার মরিলে ক্ষতি। কেন ক্ষতি?–না তাহার সঙ্গে বেশ স্বার্থ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যাহাতে আমার সুখের অন্তরায় হয় ; তাই যুবা মর্‌লে এ আপসোস, বুড়া মরলে ক্ষতি নাই। আপনে আপন পাগলের বোধ হয় যুবা বুড়া সকলের সম্বন্ধেই সমান জ্ঞান; তবে বুড়োকে কিছু বেশী ভালবাসে– কেন না, বুড়ো হদ্দ মজার চূড়ান্ত পথ গড়্‌তে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে আত্মিক ভাষার তান শ্বাসে-প্রশ্বাসে ফেলে থাকে-তাই পাগল বুড়োকে বেশী ভালবাসে।

সংসার, সংসার,–তোমার পায়ে নমস্কার। তুমি কর্ম্ম!–কর্ম্ম, কর্ম্ম তোমার পায়ে নমস্কার, কেননা যেহেতু কাজেই অতএব আমি পাগল।



কাকের ডাক

দুপুর বেলায় নিঝুম হ'য়ে গাছ তলাতে চোখ মুদে পাগল বসে অছে, কি জানি কিভাবে। কিভাবে, তার ভাব সেই জানে। অদূরে কাক ডাকিতেছিল, –কা কাওয়া, কা কাওয়া, পাগলের কানে সে রব বাজিয়া উঠিল, পাগলের প্রাণে বুঝাইয়া দিতে যাইয়া ধ্বনি হইল-খা খাওয়া, খা খাওয়া। হ্যারে, দুনিয়ার লোক, ঐ কাক তোদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া অতি গূঢ়তর প্রশ্নের উত্তর দিতেছে–খা খাওয়া। তোরা কিনা স্বার্থপর, বল্‌তেছিস্-দূর দূর দূর। ঐ প্রাচীন বামন ঠাকুরাণী বলে দিল, রাধা কৃষ্ণ কও! তার প্রাণে তাদের –কাকের গানে কি ভাব জাগিয়া জাগাইয়া এ রহস্যের সৃষ্টি করিল। হায়! হ্যায়! হ্যায়! মানুষ আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলই ভাবে ;–মনে করে জগৎখানা তার ভাবে ভাব দিলে ভাল হইত, আর যে সকল ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় তাহা আপনা ভাবে গড়িয়া লয় এবং বুঝে ও বুঝায়।

এক কৃপণ, এক বীর পুরুষ, এক রসুই ব্রাহ্মণ ও একজন ফকির–এই চারি ব্যক্তি পথিমধ্যে একত্র হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছে, পাখীগুলো গাছের ডালে পাতার তলে কত কিছু রাগিণীর আলাপ আলোচনায় ব্যতিব্যস্ত ; এমন সময় এক অচেনা পাখী গম্ভীর আওয়াজ ধরিয়া গাহিল –'হুকুকু'। পান্থ চতুষ্টয় তাহার ঐ সুগভীর স্বরে চমকিত হইয়া অর্থ করিতে বসিল। তখন কৃপণ বুঝিয়া বলিল পাখী গায়–হিসাবে খরচ। বীর পুরুষ বলিল তা' হ'বে কেন? ও গাহিতেছে-হিম্মতে মরদ। রসুই ঠাকুর বলিলেন– তোমরা কেউ বুঝ নাই। পাখি বলিতেছে, -হল্‌দি মরিচ। ফকির হাসিয়া বলিল- তা হ'বে না, ও গায়-হু আল্লামদত্! এই আন্দোলন আলোচনায় বড় রগড় শুরু হইল, ক্রমে ঝুকাঝুকি, তারপর বকাবকি। ইত্যবসরে ভাবুক অবধূত গাছতলাতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের এবম্বিধ কলরব শুনিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় তাহার অঙ্গলাবণ্য এবং মুখশ্রীই যেন তাহাদিগের মনগুলাকে টানিয়া তাহার উপর বিচারের ভার অর্পণ করিতে

বলিয়া দিল। ক্রমে পান্থচতুষ্টয়ের মন্তব্য শুনিয়া অবধূত বুঝাইয়া দিল,–এ জগৎ ভাবময় ; যাহার হৃদয়ে যে ভাবের আধিক্য, সে তদ্‌ভাবেই ভাবিত হয়–তাই বুঝি কাকের 'খা খাওয়া' শব্দ শুনে কৃপণ তাকে দূর দূর করে, – অর বামন ঠাকুরাণী নাতিনের অঙ্গমল আশঙ্কায় 'রাধাকৃষ্ণ' বল্‌তে বলে। হ্যারে পামর মানুষের মন, কই রে? কি রে? ইহা উহা আমার আমার, তার আগে পাছে কি? হ্যারে, সব মাটির বানায়া সং সাজা পুতুল, যদি দেখ, শুন, বুঝ, সব সর্বস্ব আগে মাটি, পাছে মাটি–তবে কেন কাকের খাটি কথায় দূর দূর কর?

পাগল কয়-কাক ঠিক কথা কয়, কাজেই আজ সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের পর কলিরও শেষভাগে এই গবেষণার পর এই মহাসত্য আবিস্কৃত হইয়া শ্রুতিদোষ দূর করিল,-সবে বল-হরি হরি হরি।



রূপের পূজারী

রূপের পূজারী ছুটে এসে দেখে যাও,-দুপুর রোদে পাগলটা তাকা'য়ে আছে, অনিমিষ লোচনে তাকা'য়ে আছে ঐ ফুলটির দিকে-রূপ, রূপ, রূপ, এরূপ সেরূপ, কেরূপ, কার রূপ, রুপ কি?-যারে নয়নে টানে, গ্রাহ্য করে, যাহা প্রতিফলিত হয়, তাহাই রূপ। অনন্ত এই রূপখানির গোড়ায় নাকি অরূপ। অরূপের বিকাশ বহুরূপ।-ফুলের হাসি, পূর্ণিমা নিশি, ছল্ ছল্ জোয়ারের জল, আসল নকল সাদা, সবুজ, রক্ত, পীত, নীল, কি বৃক্ষ, কি লতা, কি পাতা, কি মানুষ, কি দেবতা, রূপের আকর্ষণে সবাই হেলে দুলে, সবাই ঢেউ খেলে।

মনে নয়নে নিকট সম্বন্ধ-নয়নে মন টানে, মনে নয়ন টানে। কি জানি, কে জানে, এ টানাটানির ভিতর কি রহস্য পড়ে আছে! এ বিশ্ব দৃশ্য-গুরু শিষ্য সবাই মিলে কেবল অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে, একে আরে ঝুকাঝুকি করে, লুকালুকি খেলায়; কেউবা ফলে, কেউবা ফুলে, কেউ আসলে, কেউ নকলে, কেউ জলে, কেউ স্থলে-সবাই দেখি আঁখির তাড়নায় কেবল সম্বলছাড়া রূপের পূজারী!

তুমি, আমি, লীলারসময় হরির লীলা বৈচিত্র্যে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, অধম পুরুষ, সকল সর্বনাম রূপে মুগ্ধ, রূপে লুব্ধ, রূপে ক্ষুব্ধ, রূপে স্তব্ধ। নিস্তব্ধ রাগিণীর অনাহত আলোচনা হইতে, সেইরূপ গাহিতে ভাষায় কত ছন্দ ধরে, কত ভাল মন্দ গড়ে, কত দ্বন্দ্ব তার ভিতরে। বলি হে রূপের পূজারী! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কখন ভাবভরা প্রাণে শিশুর হাসি লক্ষ্য করিয়া থাক, প্রিয়তমার মুখশশীর দিকে ফিরে ফিরে চেয়ে শ্রান্ত হ'য়ে থাক, আঁখির পলকে ঝলকে যদি কেহ রুধির বমন করে থাক, শিশু বৎসের হাম্বা রবে কেউ কিছু দেখে থাক; বুঝে থাক, তবে বল দেখি, আঁখি কি দেখিতে চায় ? চিত্রকরের তুলিকা কত চিত্র আঁকে, কবির কল্পনা কত সোহাগ মাখে,

কিন্তু অন্তহীন, তৃপ্তিহীন এ লালসায় পরিসমাপ্তি করিতে উদ্যম করিয়া কে কবে সফলমনোরথ হইয়াছে। মায়ের শিশু সোহাগ স্বামীর পত্নী সোহাগ, যুবকের যুবতী সোহাগ, ভ্রমরের ফুলের সোহাগ, বিবাহ-বিদগ্ধ প্রাণে প্রেমবৈচিত্র্য যে ভাবে প্রেমের সোহাগ, সাধক চিত্তে ধ্যেয় দেবতার সোহাগ, বন্ধুর কাছে বন্ধুর সোহাগ-এ সকল সোহাগে যে রাগ প্রতিফলিত, সেই রাগের অভ্যন্তরে যে কারিগরের কল্পনা, কৌতুকময় আস্য হাসি দিতেছে, তাঁহার বিচিত্র মহারাগ কিরূপে রঞ্জিত? রূপের পূজারী, কার পূজা কর? চিত্রকর, কার চিত্র আঁক? কবি, কি কল্পনা কর? সেই-ঐ সেই যাঁর হাসিতে বিশ্ব বিভাসিত, তাঁর আস্য পানে তাকা'য়ে দেখ দেখি, মনোনয়ন তখন কি বলে?

পাগলটা বড় দৌড়াচ্ছে, ও সব দার্শনিক মীমাংসা রেখে দাও,-দর্শন শাস্ত্র পাগলের নয়। পাগল কয়,-হ্যারে, অরূপের পূজারী। রূপ, রূপ, রূপ, এরূপ সেরূপ এমন একটি রূপ দেখায়ে দেও দেখি, যেরূপ দেখ্লে নয়ন ফিরে না, মন ঘুরে না, কলম চলে না, ভাব জাগে না, তুলিকা থামিয়ে দাঁড়ায়, দর্শক আত্মসম্বিৎ হারায়, কখন কতক্ষণ এইরূপ, কখন কতক্ষণ সেইরূপ-মনোনয়ন তাই দেখে দেখে কেবল ঘুরছে, ফিরছে, ধরছে, ছাড়ছে কিন্তু এককালীন কেউকে ধ'রে রাখে নাই। তাহ'লে তরঙ্গ থামিয়া যাইত, এদিক সেদিক এক দিক হইত, প্রাণে প্রাণ মিশে যাইত, বান তুফান ফুরাইয়া যাইত। একটি রূপে ম'জে গেছে, একটি রূপে ম'জে আছে, এবং রূপে মজাতে পারে, এক রূপে টানিয়া ধরে, আমার ভাবের মতন এমন একটি রূপ কৈ? তোমার ভাবের মতনই বা এমন একটা রূপ কৈ? অতৃপ্ত কোলাহল কার লাগি?-শোন্ শোন্ শোন্, ঐ শোন্, পাগল গায় ;

বললো সজনি, আমি কোথা পাব সে কারিগরে।
নিখুঁত করে ভাবের ছবি যে এঁকে দিতে পারে॥
ভাবের মানুষ কি ভাবে সে গড়া,
ভাব ক'রে দেখেছি তায়, না দেয় সে ধরা;
ধর্তে গেলে আপনহারা হ'য়ে পড়ি ভাবের ভোরে।

ডুবা'য়ে দুই নয়ন তারা
দেখিয়াছি ভাবের মানুষ না যায় পাশরা,
সেত আপনি এসে ঢেউ খেলা'য়ে ডুবায়ে দেয় অতল নীরে।

ভাব ধরা এক ভাবের চেহারা
প্রাণ আমার নিয়াছে কেড়ে আপনহারা
তাঁরে ধর্তে গেলে, না দেয় ধরা,–ধ'রে দিবে কে আমারে?
গড়তে গিয়ে ভাব মূরতি ক'বার ভেঙ্গেছি,
গড়া যায় না, ধরা দেয় না, বসে ভাব্তেছি,
যে গড়েছে জগৎখানা কে গড়িয়ে দিবে তারে।
ভাবের পুতুল ত্রিবেণী উজান,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হ'য়ে বাঁশীতে ধরেছে তান,
লীলা খেলা সব এক জনার, ত্রিগুণে ত্রিগুণাকারে।

ভাবের মানুষ গড়া ত যায় না
মন মোহন ভাই তারি মন ধরিতে পায় না,
শুধু ভাব কান্তিতে আনাগোনা, লীলা নিত্য লীলা করে।



মকার

মকার আমি তোরে বড় ভালবাসি,–কেননা, আমার নামে তুমি দুইবার ; আর এই বিশ্বে তোমার বড় পসার। দেখ! জন্মেও তুমি, মরণেও তুমি, মধ্যেও তুমি, আমাতেও তুমি, তোমাতেও তুমি, আর এই মনটার মধ্যেও তুমিই,-তাইত তোমায় বড় ভালবাসি। কেন ভালবাসি?–না, আমার ঐ সকল দুঃখের অবসান, অতৃপ্তির তৃপ্তি, গ্রাসের ভিতর ঢল্ ঢল্ করিতেছ মদ্যরূপে তুমিই, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে-আহা হা! বাটীভরা কালিয়া কবাব মাংস রূপে তুমি ; হায়! হায়! আবার প্রাণতোষিণীর প্রণয়গর্ভ বনচভরা হাসি মুখের কাছে কাঠি তাড়নে মৎসরূপে তুমি ; আবার ঐ দেখতে গোল, থাক্লে গোল, না থাক্লে গোল, ঘটায় গোল, ভাঙ্গায় গোল-সেই মুদ্রা রূপেও তুমি, আর ঐ চঞ্চল আঁখিঠারে, গালভরা হাসিতে প্রাণভরা ফোয়ারাতে, যৌবনের কলঙ্ক মূর্ত্তি, জীবনের অবলম্বন, বিশ্ব সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ-মেয়েরূপেও তুমি ; কাতর কণ্ঠে আত্মবিস্মৃত হইলে যে ধ্বনি আপনা আপনি প্রাণ থেকে বে'র হয়-সেই স্নেহভরা, পীযূষ-ধারানিঃস্যন্দিনী শোকের শান্তি মাও তুমি, তান্ত্রিকের পঞ্চমকারে তোমার প্রবল প্রতিভা ; মঠে,মসজিদে, মন্দিরে তোমার মহিমা ; সিংহাসনস্থ রাজাধিরাজের আদিতে তুমি থাকিয়া তাহাকে মহারাজ বানায়েছ, ঐ গোলাবান্ধা বড় বাড়ীওয়ালাকে মহাজন বানাইয়াছ, ঐ চারিপায়ার উপর কোটপেন্টুলনধারীর আদিতে থাকিয়া মনিব বানায়েছ, পেখমধারী পাখীটাকে ময়ূর বানায়েছ ; তোমারই গুণে আকাশের চাকা চাকা জমা জল গুলাকে মেঘ কয়, মানুষে তুমি, মহিষে তুমি, দেবাদিদেবের আদিতে থাকিয়া তাঁহাকে মহাদেব বানায়েছ-সেও তুমি দেবী ত্রিলোকতারিণী-পবিত্রতোয়া সুরধুনীর বাহনেও তুমি, আর ঐ যে গাভীর দুগ্ধ মন্থন করে তাতেও তুমি, তা'হ'তে যে অমৃত উদ্ভব হয় তাহারও আগে পাছে–তুমি, বলিহারি! তোমার মহিমা!–তাই আজ তোমাকে এত কথা জুড়িয়া আমার মকারাদি মনটা ও মকারাদি নামটা উভয়টার কল্যাণের জন্য স্তুতি পাঠ করিলাম।

মকার মাতলামীতে নিওনা-কেবল মহাশয় ব্যক্তিদের আদর্শের দিকে টানিয়া লইয়া যাও, মিথ্যাতে নিও না, মহত্ত্ব প্রদান কর।



যদি

প্রাণ কেবল প্রাণের সঙ্গে মিশিতে চায়, স্বভাব কেবল স্বভাবের মত স্বভাব খুঁজিয়া বেড়ায়, মন মনের মত মন তালাস করিয়া বিমনা হ'য়ে বসিয়া থাকে, ভাব ভাবের মত ভাব না পাইয়া অভাবে চীৎকার করে, হৃদয় সহৃদয়তা বিনে জগত অন্ধকার দেখে,-প্রত্যেক মানুষের জন্যই যদি এই কথা, তবে ইহার প্রতিষেধক মহৌষধ দাস্য ও সরলতা স্বীকার করি না কেন!

আমি চাই আমাকে সকলে সেবা করুক, মহেত্ত্বর মুকুট শিরে ধারণ করি, গৌরবের ধ্বজা উড়াইয়া বসি, আত্মগরিমায় আত্মহারা হইয়া আপনার ওজন ভুলিয়া সর্বদাই অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় মাতোয়ারা। একটু স্বার্থ, কি কপটতা, কিম্বা গৌরবের গন্ধ থাকিতে হৃদয়ের বদ্ধদ্বার খুলে না বলিয়া চীৎকার শুনিতে পাই, দশ জনকে বুঝাইতে গিয়া বুঝাই, বুক ফুলা'য়ে কয়ে বেড়াই, কিন্তু আমি হয়ে দেখি না কেন? যদি প্রাণ প্রাণের আকাঙ্ক্ষায়ই আকুল পিয়াসার মদিরা পান করিয়া মত্ত হইয়া থাকে, তবে আত্ম-বলিদান শিক্ষা করি না কেন? কেন করি না?–না, তাহার মধ্যখানে একখানা যবনিকা পড়িয়াছে; সেটি আর কিছু নয়,–মাত্র 'যদি' অর্থাৎ আমরা নিজকে নিজে বিকাইতে গেলে প্রথমে 'যদি' কথাটা হৃদয়ে আসিয়াই বাধা দেয় ; যে কোন কার্য্য করিবার সময়ে 'যদি' কথাটায় আমাদিগকে পশ্চাদপদ করে, 'যদি' কথাটার তাড়নাতে অনেক সুযোগ হারাইয়া ফেলি। আদি ও অবধিহীন পাগলের কিছু 'যদি' নাই, কাজেই সে খাস-মহালের বসত বাড়ীর চির দখলি স্বত্বপ্রাপ্ত প্রজা। পাগল বুঝে–যাহা হইবার তাহা হইবেই হইবে, যাহা যাইবার তাহা যাইবেই যাইবে, যাহা থাকিবার তাহা থাকিবেই থাকিবে ; তাই সে 'যদির' বড় ধার ধারে না,–একটানা স্রোতে কেবল সম্মুখ কর্ত্তব্য করিয়া সরিয়া যায়, ভূত ভবিষ্যৎ তাহার চক্ষে ধূঁয়ার ন্যায় ধাঁধা দেখাইতে গিয়া ধাঁধা খাইয়া উড়িয়া যায়, সে আত্ম প্রত্যয়ী মহাবীর। বাস্তবিক, আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব হইতেই অবিশ্বাস আসিয়া মানুষকে 'যদি'

অব্যয়ের অপব্যয়ে আত্মহারা কাপুরুষ করিয়া তুলে। এই 'যদি' নদীর তরঙ্গে হাবুডুবু করিতে যাইয়া পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জ্ঞানহীন নাস্তিক হইয়া উঠে, ইহার আর এক কারণ কেবল পরদোষদর্শিতা। দোষদর্শন মানুষের একঘেয়ে অতিশয় স্বভাবসিদ্ধ নীচ স্বভাব। ইহাতেই ক্রমে লিপ্ততা আসিয়া এত তিক্ত রস শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্ক কলুষিত করে যে, পরে আর আত্মসামর্থ্যে সংসার সংগ্রাম ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না, বরং গরিমাতে সম্মান রক্ষা করিতে যাইয়া পরকে শিক্ষা দিবারচ্ছলে এক রকম পরপীড়নে ব্যাপৃত হইয়া দূরাচার হইয়া পড়িতে হয়।

গুরু হইয়া শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শিষ্য হইয়া শিক্ষা দেওয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার অতি উত্তম সোপান। তাড়নাতে কিম্বা কটূক্তিতে শিক্ষা না দিয়া বরং প্রীতিতে স্বভাবের সহিত মিশিয়া মিশাইয়া ক্রমোন্নতির স্তরে স্তরে শিক্ষার বীজ বপন করা–নিজ শিক্ষার মহতোমহীয়ান সহযোগিতায় পরিপূর্ণ।

অক্ষয়তুণ প্রকৃতিগ্রন্থ বিবিধ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত, মন্ত্রপূত অনিবার্য্য ব্রহ্মরুদ্রাদি মহাশক্তিসম্পন্ন বাণে পরিপূর্ণ। হে ধীমান্ বীর সাধক, আইস, আমরা দোষদর্শিতা ছাড়িয়া দিয়া, মাছির মত ব্রণ অনুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া, মধুমক্ষিকার স্বভাব অনুকরণে কুসুমে কুসুমে মধু সংগ্রহ করি, অদ্বিতীয় মহান্ বেদ, প্রকৃতিগ্রন্থ প্রকৃতির শিষ্য হইয়া আজীবন পাঠ করি, মন্ত্রপূত মহাশক্তি, ভাবশরাসন, আত্মপ্রত্যয় অক্ষয়তুণ, বিবেক সারথী পাইবার জন্য সাধনা করি, এবং তজ্জন্য মহাবীরের ন্যায় 'যদি' অব্যয়টাকে ব্যয় করিয়া উপেক্ষাতে তিতিক্ষা লাভ করি, ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই অমর হইব।

যেহেতু-

'হৃদয়রবির আকর্ষণে
জগতমেরু ঘুরে
অপার সাগর দয়াময়
সুধা দান করে'



জমাখরচ

এ কাজটা হ'ল না, ও কাজটা হ'ল না তা' ব'লে কি আর দিন্‌টা বসে থাক্‌বে, না মাসটা বসে থাকবে, না তোর কাজের লাগি সূর্য্যটা দাঁড়ায়ে থাক্‌বে? হয়তঃ তোমার কাজ আছে ব'লে গৃহিণী কিছু কাল ভাত নিয়ে বসে থাক্‌তে পারে, কিন্তু তা' ব'লে নদীর ঢেউ থেমে দাঁড়াবে না, ঐ কাকটা এতক্ষণ ডালে বসে থাকবে না; ফুলটাও এতক্ষণ ফুটে থাক্‌বে না, বাতিটাও এতকাল জ্বল্‌বে না– তারা যার যার কাজে, আপন আপন কর্ত্তব্যে কেবল যাই যাই করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি মনে কর, আজও তুমি গতকল্যের মানুষটি ; সূর্য্যটা মাথার উপর বেগার খেটে উঠে আর নামে; ব্রহ্মাণ্ডটা বুঝি তোর আমার মত ধাঁধাঁয় ঘুরে! তোমার কাছে জানি কাল, পরশু, আজ সমান- একদিন উজান ভাটি নাই; কিন্তু তা ব'লে ত নদীর জোয়ার ভাটা থেমে দাঁড়ায় না, মাথার চুলগুলা কাঁচা থাকে না, ফুলের কলিটা কলি থাকে না, পাতার অঙ্কুরটা নরম থাকে না, পাখীর ছানাটা শিশু থাকে না!–সকলেরই একটা পরিবর্ত্তন আছে, ক্ষণে ক্ষণে, মুহূর্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, নিমিষে নিমিষে তার পরিবর্ত্তন হ'তেছে ; তোমার মত আমার মত, কারোর কিছু বাকী আছে ব'লে, বাকী থাকে না; –বয়ে যায়–ক'য়ে যায়–আর দাগ রেখে যায়।

তুমি চাও, আমি চাই, কাজটা শেষ করে ফেলি, নিষ্পত্তি হ'য়ে যাক্‌, মীমাংসা হয়ে যা'ক, অবসান হ'য়ে যা'ক, শেষ হ'য়ে যা'ক্‌ বাকী, না থাক্‌। বলি, বাকী থাকে বলেইত এত ঘুরাঘুরি, থামেনা–কমেনা–আপ্‌সোস মিটেনা–জ্বালা জুড়ায় না;–বাকী পূরণ করিতে পারিবে বলিয়াইত এত চিন্তা। ইহা বাকী, উহা বাকী,–এই বাকীগুলো ঘাড়ের উপর চ'ড়ে ঝুঁকি মারে, সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাবগুলো উঁকি মারে, আর হা-হুতাশে প্রাণ কেবল ছটফট্‌ করিয়ে বেড়ায়। মৃত্যু শয্যায় রোগী চোখ্‌ভরা চাহনিতে ফিরে ফিরে চায়, কি যেন তার বাকী, কি অতৃপ্ত আশা যেন তার র'য়ে গেছে বলে ঐ চাহনিতে কয়ে দেয়,–তার প্রাণ ঐ বাকীর সঙ্গে আর ঐ আসল জমার সঙ্গে টাটানানি ক'রে হাত খিচে, পা খিচে, চোখ্‌ পাকায়, মাথা নাড়ে' আবার কি যেন কি বাকীর তরে, ভাইয়ের চোখে মায়ের চোখে, জল ঝরে, হৃদয় ফেটে যেতে চায়, সে বাকী পূরণ করিতে প্রাণ হাবুডুবু করে; –মানুষগুলা তারে কয় শোকের কান্না ; –আমি বলি, কেবল বাকীর ঝুঁকি। কেমন? –তোমরা হাতেঃ এ কথাটা ভাল

বাসিতেও পার, কারণ তোমরা একটানা স্রোতের রুই, কাতলা, আর আমি উজান ভাটীর শফরী– তোমাদের হিসাব নিকাশ জমা খরচ এক রকম, আর আমার হিসাব নিকাশ জমা খরচ আর এক রকম ; আমি কেবল মানুষের মনগুলা লয়ে, বর্ষাকালের ভেকের নিনাদে, বসন্তের কোকিলের স্বরে, ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ রবে, আলোয়ার আলোকের ছায়ায়, ফুল্ল ফুলে, নদীর জলে, মলয় বাতাসে, আর নির্মল আকাশে, শিশুর হাসিতে আর বীরের অসিতে, জননীর স্নেহে আর রমনীর সোহাগে হিসাব লেখি। দারুণ শীতে আর প্রচন্ড গ্রীষ্মে, অতলতলে আর আকাশের উপরে, শত্রুর হাসিতে আর বন্ধুর বিরক্তিতে, সাধুর নিন্দায় আর অসাধুর পুরস্কারে, হুজুগের পাছে আর নিস্তব্ধতার আগে, আলোকের রেখায় আর পাখীর পাখায়, টাকার ঝনঝনিতে আর শাঁখার কন্‌কনিতে হিসাব লেখি; যুবকের উৎসাহে, আর বৃদ্ধের নৈরাশ্যে, ঢোলের বায়াতে আর তব্‌লার ডাহিনাতে, তান্‌পুরার তানে আর ঐ ভাটীয়াল রাগিণীর গানে, হরপে হরপে জমা করি আর কখন খরচ লেখি।–আর দেখি নবপ্রসূত শিশুর মুখ আর শ্মশান ভূমির কঙ্কাল।

আমার এই খাপ্‌ছাড়া ভাবের সহিত তোমাদের মিশিবার নয়, তাইত তোমরা ভাল মানুষ আর আমি-অপদার্থ-পাগল। কেন না, তোমরা প্রত্যেক কার্য্যেরই বাকী দেখ, বাকী লেখ, আমি ওশল দিতে ভালবাসি,–ওশল আমার আঁধারের মুশল, ওশল আমর কর্ত্তব্যের কুশল।

নদীতে বান ডেকেছে, কত নঙ্গর করা জাহাজ, নৌকা ছিঁড়ে নিয়ে গেল রে, কত ভেসে গেল রে, কত শোকের কান্না, দুঃখের দীর্ঘশ্বাস, কত হাসির ফোয়ারা নীরব তালে মিশে গেল রে, কিন্তু পাগলার কলার ভেলা কেবল ঢেউয়ের তালে তালে দোলে আর খেলে। তোমাদের আছে, কাছেই তোদের বাকী থাকে,বাকী পড়ে; যার নাই তার বাকী কি, আর ওশল কি?

সহরে আগুন লেছেছে।–পাগলটা লেংটা হ'য়ে নাচে, আর হুহু ক'রে হাসে। মহাজন কয়-কেন রে পাগল হাস, পরের বিপদ কি ভালবাস? পাগলের গাছ থেকে পাগলিনী কয়-হ্যারে! না-তা' না না, দেখলাম আমি, যার অনেক আছে, তার অনেক আপসোস র'য়ে গেল, হ"য়ে গেল; আমি কাঙ্গালিনী আমার কিছু নাই, তোদের ওশল বাকী পুড়ে গেল, আর আমার বাকীর ঘরে ওশল পড়ে আজ হাসি উঠ্‌ল। যার কিছু নাই-সে ভাল, ওশলের ঘরে জমা ; আর যার অনেক আছে তার কেবল খরচ; খরচে শান্তি কই, আর ওশলে অশান্তি কই? পাগলে জমাখরচ হিসাবনিকাশের বিল আজ তোমাদের হাতে দিলাম। বলি! কেউ কিছু দাবি করবে্না ত?



আরাধনা

দয়াময়!

এম্‌নি ভাবে দিন কি যাবে?
না, ভাবের ব্যত্যয় হবে।
রাখ্‌লে সুখে র'লেম দুঃখে
সুখে দুঃখে সমভাবে।
কিনার ঘেসে চল্‌ছি ভেসে,
যাহা ইচ্ছা তাহা হ'বে।
যখন যেম্নি তখণ তেম্নি,
মন কেন বিষাদে র'বে।

'কবির হাসে পিয়া না পাইয়ে যিন্ যিন্ পায়া তিন্ তিন্ রোয়। হাসি খেল্ যো পিয়া মিলে, তা কোন্ দোহাগিনী হায়।'

প্রেমময় হরি দয়াময়!

প্রেমময়! তোমায় কি বলিব? বল দেখি কি বলিব? প্রাণ কি চায়-তুমি জান, হৃদয় কি বলে-তুমি শুন; হে সোহাগশশী! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তোমার অবিদিত কিছুই নাই, জানিয়া শুনিয়া কেন এমনতর করিতেছ! তোমার লজ্জা নাই, মানাপমান নাই, তাই ক্ষোভ দুঃখও নাই, কিন্ত এ হৃদয়ে তো ত আছো ? তুমিই তেমন হইয়া কার্য্য করিতেছে, দুঃখের দাবগাহে পোড়াইয়া অনুতাপ অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতেছ; ছি, নাথ! আপন জনের সঙ্গে কি কভু এমন করিতে হয়। দুই হৃদয় সমান না হইলেই মিশে না, আমারে তোমার মত করিয়া নেও না, মিশায়ে নেও না, মণি! কেন, মিছামিছি কাঁদা'য়ে কাঁদায়ে এত বাতনা দিতেছ' এই কি সখা ভালবাসার পচিয়? মান করাও ত এমন নয়! -যা' কে মান বলে, তাহা ক্ষণিও অনুরাগ বৃদ্ধির পূর্ব্বা কার্য্য বৈ ত নয়? কিন্তু হে প্রাণ! তোমার এ কেমন খেলা, এ কেমন মান, ক্ষণস্থায়ী পিপীলিকার প্রাণে অত বড় ভার কি সইতে পারে, ...তাও তুমি জান ; তাই বলি, জানি শুনিয়া কেন এমনতর করিতেছ!

প্রীতির ছবি লজ্জা দিবে-এই কি তোমার ইচ্ছা? আমি কাঁদিব, লোকে হাসিবে-তাই কি হরি তোমার ভাল লাগিবে, তাইতে কি সুখী হইবে?

যে জন তোমা বিনে চিনে না অন্য জনে,
তারে কাঁদাইয়ে (নাথ হে!) দেও কি দয়ার পরিচয়?

সুখী হও ত বল, দুঃখ করিব না ; সেহেতু তোমার সুখের জন্যই ত সব। আমি চাই কি?– তুমি সুখী হও, তাইতো চাই তোমারই কার্য্য অবাধে জীবনের উপর দিয়া হয়ে যাক্, তাইতো চাই,-বল নাথ! তাতে কি তুমি সুখী হইবে, না, সুখ পাবে না?–তুমি তো কাঙ্গাল শরণ পতিত-পাবন, হে দীন নাথ! তখন কি দীনের কান্নায় তোমার হৃদয় বিগলিত হইবে না? বিপন্ন বিষাদিত দেখিয়া কি নিশ্চিত মনে বসিয়া থাকিতে পারিবে? পারিবে না, –ছুটিয়া আসিবে, কোলে নিবে, সান্ত্বনা দিবে, তাই কি ভাল লাগিবে? ভালবাসিবে? প্রেমব্রত! মহাপ্রেমে তোমার হৃদয় গঠিত, হে জগৎপ্রেমাধার! প্রেমিক হৃদয় তো কোন কালে কান্না-কাটা শুনিতে চায় না,–জানি, আশ্রিতের এক বিন্দু অশ্রুজল তাঁহার বক্ষের শোণিত হতেও অধিক, তবে তুমি কাঁদাতে চাও কেন ? সখা! বল দেখি, তুমি নিজে নিত্য বিকশিত হইয়া আমাকে মুদিত করিতে বাসনা কেন? হে শ্রদ্ধার নবনী পুতুল! কেন-কেন ? পদে পদে বিপদে ফেলিয়া আপ্‌না জনে এম্‌নিভাবে কাঁদাও কেন? এই এত লজ্জা, অপমান, লাঞ্জনা-এত কি প্রাণে সয় ? হৃদয় জ্বলিয়া গিয়াছে, হা পোড়া কপাল! যে ভালবাসিবে, যে আদর করিবে, সে করে না, আর করিবে কে? বল দেখি প্রাণনাথ! কি দোষে এম্‌নি করে প্রাণটাকে যাতনা দিতেছ? কোথায় থাক জানি না, ভালবাসা আছে, হৃদয়টা টানে এই মাত্র পরিচয়, কোন দিন দেখি নাই, দেখা দিবে কিনা, হবে কি না–তুমিই জান!! নিরপেক্ষ মহান্ ঈশ্বর লোকে তোমায় বলে, তাই আমিও বলি; কি আকার, কেমন হাবভাব-কেমনে জানিব? যদিও কেহ কোন দিন দেখে থাকে, দারুণ স্বার্থপরতার বশে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না। হে নাথ! তুমি দেখা দিতেছ না, তবুও তোমার প্রীত্যর্থে কত করিতেছি,–এই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, শোয়া নাই, বসা নাই, কেবল তোমায় স্মরণ কোরে কোরে কেঁদে থাকি, কত না অনুতাপ করি, কেন করি, কি চাই? তোমার কাছে কি চাই? তাইতে এমন করি-না কিছু চাই না; লোকে যা চায়, আমি তা চাই না; তবে তোমার ডাকি কেন? স্মরণ করি কেন?– কেন করি, বলিতে পারি না ; তবে একটু কেমন কেমন সুখ লাগে, তাই আর যেন না ডেকে থাকিতে পারি না; অযাচিত ভাবে হৃদয় ডাকে প্রাণ হাঁকে,– তাই ডাকি। তুমি কে? হে নটবর! তুমি কে? তুমি ছবি-প্রাণের, প্রীতির, প্রেমের শ্রদ্ধার, ভক্তির ছবি। আর কি, আর তুমি কে? তুমি, শুদ্ধ, সত্য, একমাত্র বিরাট জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম। আর তুমি কে? তাইতো–তুমি স্বপ্নময়! দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, বিশ্বতঃচক্ষু, তোমার কিছুই নাই, কিন্তু সব আছে,

তুমি হে দেবদেব! তুমি সুন্দর হ'তেও সুন্দর, মধুর হ'তেও মধুর, নির্ম্মল হ'তেও নির্ম্মল, তোমার তুলনা নাই। হে জগন্ময় মহাপুরুষ! তুমি ছাড়া আর কি আছে যে তার সঙ্গে তুলনা দিব, তুমি অসীম, অনন্ত, অন্তরে বাহিরে প্রত্যেক অণুপরমাণুতে একমাত্র তোমার সত্ত্বা, হে প্রাণপুরুষ! তুমি নির্বিকার মহাপুরুষ, আমরা যাহাকে দুর্ভেদ্য বলি তাহার মধ্য দিয়াও তোমারই জ্যোতি বর্ত্তমান, প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস, প্রত্যেক কার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সংসার অসংসার, সকলই তোমার জ্যোতির ভিতর, একমাত্র তৃপ্তিপ্রদ, শান্তিপ্রদ, মোক্ষপ্রদ, তোমারই জ্যোতি বর্তমান; এই যে অনন্ত আকাশ, গভীর জলধি, সুন্দর সৌরমণ্ডল, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা-সকলই তোমার বিভূতি, এই-ই তোমার রকম, এই-ই তোমার ভাব ; আলোক, অন্ধকার, তোমারই বর্ণহীন অঙ্গের বর্ণ বিশেষ। হে দেব! প্রকৃতি, পুরুষ, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ-সকলই তুমি; তুমি ভোক্তা তুমি ভোগ্য, তুমি ভোগ!!!-হে বিশ্বতঃচক্ষু! তুমি আমায় দেখ, আমায় চিন, আমি তোমায় দেখিয়াও দেখি না, চিনিয়াও চিনি না, জানিয়াও জানি না, কিন্তু ভালবাসি, স্নেহ করি, আদর করি, ভক্তি করি,-কিন্তু হে বঁধো। তোমার কেমন হৃদয়?-তুমি দেখে শুনেও যেন দেখ না, শুনো না, ভালবাস কিনা জানি না, তোমার ভলবাসা কেমন, তা'ও বলিতে পারিব না .... অভাবেই লোকে ভাবানুসন্ধান করে, কিন্তু তাও তো নয়, আমার হৃদয় তো তোমার কাছে কিছু চায় না, তোমায় ভালবাসিয়াই, তোমার নাম করিয়াই সুখী থাকে ; তুমি ভাল না বাসিলে পার, যেহেতু তুমি রাজরাজেশ্বর, কত মহৎ, কত জ্ঞানী, কত ধনীর সঙ্গে তোমার প্রেম, সমানে সমানে মিশে ভাল ; প্রত্যাশাও করিতে পারি না-ভালবাসা পাইব; তবে কি পাইব না, তাই নাকি? হা নাথ! তবে কি, তবে কি প্রভো ! দীনের যে এত আয়োজন সকলই অযথা, তুমি কিছু না দেও, দিও না, চাই না, আমি যা কিছু দেব,-তোমার কাছে ভিক্ষা মাগিয়া আমি যা কিছু তোমাকেই দিবার তরে সে সংগ্রহ করিয়া অতি সযতনে রেখেছি-তা'ও কি-সেই ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা, পবিত্রতা-লবে না, হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, ঘৃণা কি লবে না? কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ কি লবে না? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক কি লবে না? অস্থি, চর্ম্ম, মাংশপেশী কি লাবে না? রক্ত, পিত্ত, কফ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, শুচি, অশুচি-যা নাকি প্রভো! যা' নাকি হৃদয় থালাতে মানস-কুশাতে সযতনে রেখে-তা' কি লবে না? আমি ত দিতে চাই-ঘৃণা কি করিবে? না, প্রেমের কাছে,

ভাবাসার কাছে তো ঘৃণা নাই, তুমি সাম্যের প্রতিমূর্তি সমতার রাজ্যে! তোমার অধিষ্ঠান, তাই বলি ঘৃণা করিও না।

লও প্রাণ, লও মন, লও হৃদয়ের ধন।
নিভৃত হৃদয়-কক্ষে যা আছে গোপন।

লও! নেও এসে হে নাথ! দীনাথ! তবে এস! প্রেমময়, প্রীতির ছবি! তোমার জগন্মুগ্ধ প্রেমের থালা হাতে নিয়ে এস, হে সোহাগ শশী! সোহাগের স্নেহ পদার্থ হাতে করে এস; হৃদয়মণি? মান করো না, যাতনা দিতে কম দেও নাই, তাই বলি হে নিত্য বিকশিত পুরুষ, হাসিয়া হাসিয়া অধরোষ্ঠে অমিয় মাখিয়া এসে উপনীত হও ; আমি লজ্জা, ভয়, ধন,কুল, মান, যত কিছু তোমার ও রাঙ্গাচরণে সঁপে দিয়ে ভাসিয়ে যাই-প্রভো! শান্তির সলিলে, প্রেমের নদীতে একটানা স্রোতে গা ভাসান দিয়া চলিয়া যাই।

আসিবে কি? প্রেমময়, আসিবে কি? হে জ্যোতির ছবি! স্নেহের চেহারা। আসিবে কি? হৃদয় ধামে তোমার সেই-অই সেই, যেরূপে জগৎ মুগ্ধ, জীব লুব্ধ, সেরূপে প্রকাশিত হবে কি?-হও, পায়ে পড়ি, হও হাতে ধরি, হও, আলিঙ্গন করি, হও, হবে না কেন, হও, হতেই হবে, হও!!!

অন্তরে বাহিরে মীমাংসা যোগ আনিয়া বিষয় বিকারে শান্তি দান কর, মনের আবেগ কার্যের যোগ শেষ করিয়া তোমাতে স্থাপন কর, নামের মহিমা দিগ্‌দিগন্ত বিভাসিত হউক, আমি তুমিতে লয় হউক-জয় হরি দয়াময়!!
হে নাথ!

১

প্রাণের প্রেমের ছবি আকুল অন্তরে অতি
বাড়ায়ে যুগল পানি করিতেছি আবাহন,
ভক্তি প্রীতি ছুটাছুটি অন্ধকারে আঁতিপাঁতি
খুঁজিয়ে বেড়ায় তোমা, দিবে নাকি দরশন?

২

ধাইছে বাসনা নদী সতত তোমার দিকে,
উঠাইয়ে সুখ উর্ম্মি অতি ঘোর গরজনে,
গাইয়ে তোমার নাম, চেয়ে আছে অনিমিষে,
শীতল কর রে প্রাণ দিয়ে দেখা মন্মোহনে।



নক্‌সা

ছোট বেলায় পিতামাতা আদর করিয়া আমাকে লাঠু বা লাঠিম বলিয়া ডাকিত। এখন আমার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুইবার ফে'ল হইয়াছি ; পৈর্তৃক সম্পত্তিতে এক প্রকার মোটা ভাত মোটা কাপড় চলে। দেশের বাড়ীতে লালবিহানী বাবু এবং সহরে লালা বাবু ব'লে পরিচিত হইয়াছি, বাহিরে বেশ প্রসার দু'দশজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেজায় ইয়ারকি, হাসিঠাট্টা, কৌতুক গল্প, গুজব চারিদিকে রসের ছড়াছড়ি, হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি,-কোন কথার অভাব নাই, বেশ খাই, পরি বেড়াই। কিন্তু মাঝে মাঝে কেন যেন মনটা চম্‌কে উঠে, প্রাণটা কেমন করে শিহরে শিহরে উঠে- কি যেন অভাব উপলব্ধি হয়। হ'তেছে হয়, হউক, সে দিকে বড় লক্ষ্য রাখি না, চলিয়াছি-কোথায় যাই জানি না। প্রভাত হয়, আবার সন্ধ্যা আবার প্রভাত, আবার সন্ধ্যা, দিন রাতি আসে আর যায়, বেশ ত ক'দিন বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনের যবনিকার আড়ালে খেলিয়া কাটাইলাম অগ্রপশ্চাৎ-ভাবনা-বিহীন হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে এত দূর আসিয়া পড়িয়াছি, সহস্র অভাবের ধাক্কায় আশার লোফালোফিতে কেবল উড্ডীয়মান ঘুড়ির মত ঘুরিতেছি।

বসে বসে ভাবি এক বড় মজার কথা, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শয়ন অবস্থায় যখন অভাবের ভাব জাগিয়া উঠে, তখন হাওয়ার পুতুল মনখানাকে লইয়া নন্দদুলালটীর মত বড় আব্দারের ঘটা পড়িয়া যায়। প্রথমে মনে করি রাস্তায় চলিতে চলিতে যেন টাকার কলসী পাইলাম, তা' দিয়া কত বড় বাড়ী, বড় ঘর, তালুকদারী, জমিদারী খরিদ করিয়া রাজা, উজির হ'য়ে পড়িলাম। গড়িয়া গড়িয়া বড় সুখের সংসার নাট্যশালাতে অতি উত্তম অভিনেতা সাজিলালম, আবার মুহূর্ত্ত পরে যেই সেই। ক্ষণিক পর আবার ভাবিলাম বাড়ী ঘর দালান কোঠা কিছুতেই যেন তৃপ্তি নাই। সন্নাসী সাজিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে চলিলাম, সিদ্ধপুরুষের সেবা করিয়া বর পাইলাম, তাহাতে ইহা উহা কত কিছু গড়িয়া তুলিলাম, আবার ভাঙ্গিয়া গেল। এই ভাঙ্গা-গড়া ভাঙ্গা-গড়ার হুজুগে দিবস রজনী চলিয়াছি-কখন চুরি, কখন বাহাদুরী, কখন উজিরী, কখন ফকিরি, কখন সাধু, কখন সন্ন্যাসী, কখন উদাসী-কতই

হইতেছি, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই নয়। মনে করি কতই করি, কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছি না; মনে করি কতই শিখিব কিন্তু কিছুই শিখিতে পারিতেছি না। পৈর্তৃক সম্পত্তির আয়ে সংসার বেশ চলিত। মনে করিলাম আট দশ টাকা মাসিক বেশী পাইলে বেশ সুধি হয়- তা' হইল ; কিন্তু তা'তে হইল না। মনে করিলাম বিশ টাকাতে হয়তঃ হইবে-তা'ও হইল; কিন্তু তাতেও হইল না। মনে করিলাম বিশ টাকাতে হয়তঃ হইবে–তা'ও হইল ; কিন্তু তাতেও হইল না। তখন মনে করিলাম পঞ্চাশ টাকা আয়ের কম কিছুতেই হইতে পারে না, ক'দিন পরে দেখি তাতেও হইয়া উঠিল না। ভাবিলাম ব্যাপারটা কি!-সর্ব্বদাই মনে করি ধর্ম্ম পথে চলিয়া জীবন সার্থক করিব, কিন্তু হিসাবের গড়পরতায় দেখি তার কিছুই হইয়া উঠিতেছে না। কেন হয় না, কেন হইতেছে না, –তা'বুঝি কই? বুঝিলে, চাই না বা কেন? সহপাঠিদের মধ্যে যারা পর্দায় নামাঙ্কিত করিয়া গ্রেজুয়েট হইয়াছেন, নিরালায় আড়ালে কয়েক বৎসর পূর্বে মিলিয়া মিশিয়া কত সময় সরলতা নিঃস্বার্থপরতার ভান করিয়া প্রত্যেকেই বাহাদুরি দেখাইয়াছি, এখন দেখি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আইনবাগীশ হইয়া পড়িয়াছেন, বে-আইনের বড় ধার ধারেন না,–কিন্তু আপন আপন মক্কেলের স্বার্থের সঙ্গে আপনার যৎসামান্য বিজড়িত স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য কত মিছা কথা, কত শঠতা শিখাইয়া, দেখাইয়া, সমাজকে উপহার দিয়া বেশ জাহির হইয়াছেন।

এক দিন এক শৈশব সুহৃদ্ খ্যাতনামা উকিলের বাসায় বেড়াইতে গিয়া দেখি কয়েকজন গ্রাম্য নিরক্ষর চাষা লোক দরবারে উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে উকিল বাবু তাহার হাজার টাকা দাবীর মোকদ্দমার স্বপক্ষে কোন একটা মিথ্যা কথা বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্ররোচনা করিতেছে। যতবার মক্কেলের কর্ণে ঐ কথা প্রবেশ করিতেছে, তত বার সে ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া কেন অঙ্গুলী প্রদান করিতেছে; ইহাতে সেই বাবু ভ্রূকুটী প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যা বেটা, তোর এই সসতার আবশ্যক নাই, মোকদ্দমা করতে এ'সে, বাপু, এত সত্যবাদী হ'লে চলে না। যেই এই কথা বলা, অমনি সেই লোকটি পকেট হইতে তাহার হাজার টাকার দলিল বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সকলে অবাক্!

বলি! বিদ্যাবত্তার ত এই পর্যন্ত হাল, নিরক্ষর চাষার কাছেও নাকাল হ'তে হইয়াছে! ভাবগতিক দেখিয়া, কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিলাম। রাস্তায় এক ভদ্রলোকের সন্তানকে হাতকড়ি দিয়া কয়েকজন কনেস্টবল নিয়া চলিয়াছে, ইনি শৌণ্ডিকালয়ে সর্ব্বস্ব খোয়ইয়া মনমোহিনীর মন রক্ষা করিতে চুরিতে মন দিয়াছিলেন, তা'তে এ হাল হইয়াছে।

কতদূর যাইয়া আবার দেখি, আর একটি ভদ্র সন্তান অস্থি-চর্ম-সার, সকল শরীরে ফোস্কা হইয়াছে, ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া রাস্তায় অধোমুখে চলিয়াছে। দেখিয়া পূর্ব পরিচিতের ন্যায় বোধ হইল ; নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলাম, ইনিও আমার একজন বাল্যবন্ধু। যৌবনের অযথা অস্বাভাবিক ব্যয়ে বেশ্যাসক্তিকে পরিণামে এই দাঁড়াইয়াছে।

তারপর আর কতদূর যাইয়া দেখি, এক শব চিতা উপরি কাষ্ঠশয্যায় শয়িত। বোরুদ্যমান্ বন্ধু বান্ধব চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। ইনিও এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র। দূরে শুনিতে পাইলাম-কেহ বলিতেছে, 'ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়'। ধীরে ধীরে আপন মনে চলিয়াছি, ক্রমে যাইয়া দেখিলাম, পাঁচ সাত জন মুটে মুজুর পরস্পর বলাবলি করিতেছে; একজন বলিতেছে–

ওহে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি
তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে,
কে কোথা হয়েছে সুখী,
অধর্ম্ম পাপাচারে।

বিষয়টা কি জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিতে পাইলাম–এই শ্মশানশায়িত শবকায়, জোরে জব্বরে নিরক্ষর অনেক দরিদ্রের সর্বনাশ করিয়াছে, অনেক খুন খয়রাত করিয়াছে, আজ পাঁচ সাত দিন হইল তাহার স্ত্রী পুত্র সংক্রামক কলেরা ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সামান্য তালুকদারী অষ্টমের লাটে, তিনি নিজে চিতাশায়ী। হু হু করিয়া প্রাণের ভাবের আবেগ ছুটিল। পশ্চাতে কিসের কলরব হইতেছিল, ফিরে দেখি এক পাগলের পাছে কতকগুলি বালক হাত তালি দিয়া নাচিতেছে ও দৌড়াইতেছে। পরিধানে দিক্-বসন, সর্বাঙ্গে ধূলী, কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন গায়, কখন বা আপন আপনি বিড় বিড় করিয়া বকে। তার কাছে গেলাম, কাহারো কোন জিজ্ঞাসার ধার ধারে না, আপনা আপনি বলিয়া যাইতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। একবার চীৎকার করিয়া বলিল 'বেজায় আওয়াজ হদ্দ মজা' আবার ছোট করিয়া বলিল

'যেমনি, মজা, তেম্‌নি সাজা,–রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, যেম্‌নি মজা তেম্‌নি সাজা; মোহনী চাহনী বাঁকা, করো নাই তাতে রক্ষা, লেখালেখি টাকা সিকি, হিসাবে আসল বাকী ; যখন ঠেকি তখন শিখি'। ইত্যাদি অর্থছাড়া, অভিধান ছাড়া, ব্যাকরণ ছাড়া অযৌক্তিক প্রলাপ শুনিয়া বাস্তবিক আমার হৃদয়ে অনেক রহস্যের মীমাংসা যুক্তি আসিতে লাগিল; তাই পাগলটাকে হাত টানিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। আর ক্ষণে ক্ষণে মনে করি, কেন পারি না?-হতে, চাই কেন পারি না? এই সকল মানসিক দ্বন্দ্ব প্রতিহত কল্পনা, কল্পনা দিয়া জড়াইয়া ধরিলাম। প্রথম তাহার গালাগালির চোটে হার মানিতে হইয়াছিল, তারপর দেখি বাস্তবিক সে ঠিক কথা কয়। আমরা যাহাকে বুদ্ধি বলি, বিদ্যা বলি, পাগলের সমালোচনায়-চিত্তশুদ্ধির অভাবে দেখিলাম তাহাই প্রকৃত পাগলামী,–নির্ব্বুদ্ধিতা ও মুর্খতা। আমরা যে সকল যুক্তির বন্ধনে জীবন-তরণীকে ভবের নদীতে আটকাইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছি, পাগলের উক্তিতে সেই নায়ের নঙ্গরের কাছি, দড়ি, শিকল কি জানি কি এক মন্ত্র বলে হট্ হট্ করিয়া ছুটিয়া পড়িল। একি তাজ্জব ব্যাপার!- যার জন্য আমাদের এত ছুটাছুটি হটাহটি, যার জন্য আমরা কারণে পৌঁছিতে পারিতেছি না, যে কারণে কারণের গোড়ায় অকারণ সৃষ্টি করিতেছি, পুর্ণসঙ্কল্প ও পূর্ণকাম হইতে যে সকল কারণ আমাদের কর্তব্যে বাধা দিতেছে, পাগলের সমালোচনাতে বু'ঝে দেখি, চোয়ে দেখি, বাস্তবিক আমাদের গোড়ায় গলদ।

কেমন করিয়া শান্তি পাইব? আনন্দ পাইব?-সিদ্ধ সঙ্কল্প হইব? আমাদের কর্ত্তব্যের মুখে কেবল অকর্ত্তব্যের ঠেলাঠেলি, কর্ম্মের মুখে অকর্ম্মের ঝুঁকাঝুঁকি, সত্যের পশ্চাতে মিথ্যার হাঁকাহাঁকি, নিস্তব্ধতার মধ্যখানে ঘোরতর ডাকাডাকি।

শান্তির মলয় হাওয়া অহঙ্কাররূপী রুদ্রের নিশ্বাসে উত্তপ্ত, মাধুর্যের নির্ম্মল সলিল মাৎসর্য্য বিকারে, কর্দ্দম, ভালবাসার সুন্দর চিত্র স্বার্থপরতা এবং ক্রোধে কলঙ্কিত, মানবের সর্বস্ব মনখানা লোভ ও মোহে লাঠিমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায় ; –কিসে কি হইবে? আমিত ছোট বেলায় পিতামাতার আদরের লাঠিম। ঘুরিতে ঘুরিতে, পাকাইয়া পাকাইয়া খেলোয়াড়ারের হস্ত কৌশলে আজ পাগলের চেলা। পাগল, পাগল, পাগল, সকলে তোমায় পাগল বলুক, আমি বলি তুমিই প্রকৃত বুদ্ধিমান ; বিদ্বান্। সকলে বলুক তোমার কিছু নাই; আমি দেখি তোমার সব চেয়ে বেশি সকল আছে। পাগল, আশীর্ব্বাদ- কর আর যেন ঘুরি না। কি ক'রে এখন ছোট বেলায় লাঠু বা লাঠিম হয়ে থাকি! বম্ ভোলানাথ!!



যার যা খুশী

এ সংসারে যার যা খুশী, সে তাই করে।- যে মদে খুশী, সে মদ খায়, যার বেশ্যাতে খুশী, সে বেশ্যাসক্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, কেহ বা পরনারীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করে; যার হিংসাতে খুশী, সে সর্বদা পরর চুক্লী গাহিয়া বেড়ায়, এবং পরের দোষ অনুসন্ধান করে; যার লাগাইতে খুশী, সে লাগায়; যার ভাঙ্গাইতে খুশী, সে ভাঙ্গায়; যার ঐশ্বর্য্যে খুশী, সে অর্থের জন্য সহস্র অনর্থ সৃষ্টি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; যার মাধুর্য্যে খুশী, সে সর্বস্ব খোয়াইয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লয় ; যার পরার্থে খুশী সে মর্ত্তখানা আপনার করলগত করিতে চায়; যার পরার্থে খুশী সে আপন বিত্ত অর্থ, এমন কি জীবন পর্যন্ত; পরের তরে উৎসর্গ করে, যার সম্মানে খুশী, সে ধরাখানা সরার মত পদদলিত করিয়া রাখিতে চায়; যার লোভে খুশী, সে চুরি করে, যার সৌন্দর্য্যে খুশী, সে কত সুষমার উপকরণে ডালি সাজাইয়া তৃপ্ত হ'তে চায়; যার সঙ্গীতে খুশী, সে গেয়ে বেড়ায় ; যার যা খুশী, সে তাহারই আন্দোলনে, আলোচনায় জীবন ঢালিয়া দিয়া নিজকে নিজে কৃতার্থ মনে করে।

কোন্ বাঁশীর টানে খুশীর তরঙ্গে গা ভাসান দিয়া মানবকুল ব্রজনারীর ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়, সেই বাঁশীকে, সেই বংশীধরকে কেহ আংশিক ভাবেও অনুসন্ধান করিয়া দেখে না। যদি কেউ দেখিতে চায় বা দেখিতে যায় তবে এ সংসার নাট্যশালায় সে সহস্র অভিনেতা ও অনন্ত দর্শকের নিকট মু'টে মজুর হইতেও অধমাধম স্তরে নিক্ষিপ্ত হয়, তার নাম হয় পাগলা-আর সকলে ভাল মানুষ। তরঙ্গের রঙ্গে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বীচিমালার সঙ্গে হিজিবিজি করিয়া সহতানে তান ধরিয়া তারা ভাল মানুষ, আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে চড়িবার চেষ্টা করিয়া সে কি?-না, একটা পাগল। পিতামাতা স্বার্থের বঞ্চনায় তাহাকে তাড়ায়, প্রতিবেশী যার যা খুশী বলিয়া বেড়ায়, প্রণয়িনী অপ্রণয়ের সৃষ্টি করে, ইহার নাম সংসার–'সং' যাহার সার।

আমরা সং এর পুতুল, সং সাজিযা ঢং করিয়া রং পর রং অনুক্ষণ যং বং লং করিয়া সাজাইতেছি, হাসিয়া হাসাইতেছি, কাঁদিয়া কাঁদাইতেছি, কিন্তু, পরন্তু, এবং ও ; আর, যদ্যপি, সুতরাং, কাজেকাজেই এই কতকগুলি অব্যয়কে মূলধন করিয়া মজলিসি রহস্যে ব্যয়ের মাত্রা চড়াইয়া ভাল হইতে গিয়া আলো নিবাইয়া দিতেছি। বিদ্যা উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ওকালতি, অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য বেশ্যাগীতি, ধর্ম্ম উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ঠকাঠকি, যশ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য বকাবকি, পণ্ডিত হইবার উদ্দেশ্য লেখালেখি, সুখী হইবার উদ্দেশ্য একাএকি।

পাগল কয়, এই সংসারের উপায় কি? এই মানুষের উপায় কি? এই বেহুসের উপায় কি? এ সন্তোসের উপায় কি? এই আপসোসের উপায় কি? বৈঠকী রহস্যে বসিয়া সকলেই মাথা চুলকাইয়া বলিবেন যে-হাঁ ইহা ভুল। বলি, এই ভুল শব্দটি কাহার শিক্ষার জন্য ব্যয় হইল, ইহা কি নিজকে নিজে বলা হইল? না কি আমাকে, তাহাকে, ইহাকে উহাকে নির্দেশ করিয়া শিক্ষা গুরু হইলেন, না কি, ইহা বৃথা বাক্যব্যয়-কোন্টা ঠিক? পাগল কয়, ইহার একটাও না। তবুও তোমরা এ আসরে বাসর ঘরের জামাই, আর পাগলের কেহ নাই। নাই-নাই-নাই, সেই ভাল, থাক্, থাক্, থাক্, তোরাই থাক্, ফাক্, ফাক্, ফাক্, ফাকা আওয়াজে বাজুক বাঁশী। প্রাণ উদাসী পাগলটা দিবানিশি সন্ন্যাসী হওয়ার পথ চিনিয়া লউক। যার যা খুশী তাই কর, খুশীর আগে পাছে মাঝখানে একটু প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া দেখিলে ভাল হয় না কি? আর কিছু নয়। ইতি



বাস্তবিক তা' নয়

প্রকৃতির দয়িততনয় অপোগণ্ড শিশু তুমি যা ভেবে ঠোটের কোণে হাসি কান্না মাখিয় সুন্দর অভিনয়ের সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি যাহাই বুঝে থাক না কেন–পাগল কয়-বাস্তবিক তা নয়। স্নেহময়ী জননী, তুমি যা ভেবে সন্তানকে স্তনপান করাইতেছ, তাহার মলমূত্রে অভিষিক্ত হইতেছ, ফিরে ফিরে নাকে মুখে চুমু খাইতেছ, বাস্তবিক তা নয়, জনক, তুমি যা ভেবে স্ত্রী পুত্রের জন্য হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতেছ; বাস্তবিক তা' নয়। বালক, তুমি যা ভেবে দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করিতেছ, বাস্তবিক তা' নয়। কিশোর তুমি যা' ভেবে রঙ্গের ঘরে সং সাজিতেছ, বাস্তবিক তা' নয়। যুবক, তুমি যা ভেবে হাপে ধাপে জগৎখানা মাত্ করিবার উপক্রম দেখিতেছ, যা' ভেবে যুবতীর আলেখ্য হৃদয়ে আঁকিয়াছ, বাস্তবিক তা' নয়। পৌঢ়, তুমি যা' ভেবে এত রূঢ়, ক্রুর হইয়া মূঢ়ের ন্যায় আত্মস্বার্থ দেখিতেছ, বাস্তবিক তা নয়। বৃদ্ধ, তুমি যা ভেবে পুত্র ও পৌত্রাদি নিয়া আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বসে বসে ক্ষণে ক্ষণে হরি, কৃষ্ণ কালী, রাম বলিতেছ ও কত কিছু ভাবের অবতারণা করিয়া গল্প গুজবে দিন কাটাইতেছ, বাস্তবিক তা' নয়। মাতাল, তুমি যা' ভেবে সুরাকে প্রাণের বন্ধু ভাবিয়া ধুম্‌ধাম করিতেছ বাস্তবিক তা' নয়। ধনী, তুমি যা, ভেবে ধনগৌরবে আত্মহারা, দরিদ্রের নিষ্পেষণে মাতোয়ারা, বাস্তবিক তা' নয়। ছাত্র, তুমি যা' ভেবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তাড়না সহ্য ক'রে বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছ, বাস্তবিক তা' নয়। শিক্ষক, তুমি যা ভেবে শিক্ষা দিতেছ, বাস্তবিক তা' নয় দরিদ্র, তুমি যা ভেবে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বোম্ হ'য়ে ব'সে থাক, বাস্তবিক তা নয়। ধার্ম্মিক, তুমি যা ভেবে ধর্ম্মের বড়াই করিতেছ, নানা চিহ্নে কলেবর সজ্জিত করিয়া ধর্ম্মের বিপনীতে চিহ্নিত দোকানদার সাজিয়াছ, বাস্তবিক তা' নয়। বাউল, বৈরাগী, তোমরা যা ভেবে খঞ্জনী চাপ্‌ড়াইয়া হরিসঙ্কীর্তনে মাতিয়াছ,

বাস্তবিক তা' নয়। পাপী, তুমি স্বীয় অপরাধ স্মরণে যা ভেবে প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্পে কত কিছু করিতেছ, বাস্তবিক তা' নয়। হাকিম, তুমি উচ্চাসনে বসিয়া আপনার যে প্রতিপত্তি ভাবিতেছ, বাস্তবিক তা' নয়। উকিল, আপনার বুদ্ধির দৌড়ে যতই যশ কেন কিনিতেছ না, মনে যাহা ভাবিয়াছ বাস্তবিক তা' নয়। বক্তা, তুমি বুক ফুলাইয়া দশজনকে প্রাণপণে যাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য কল্‌কল্ নাদে দিগন্ত মুখরিত করিতেছ বাস্তবিক তা' নয়। যে যাহাই ভাবিয়া সংসার নাট্য-মঞ্চে যে অভিনয় করিতেছ, ও যাহাতে আত্মমন সংযোগ করিয়া মনে মনে যাহা ভাবিতেছ, বাস্তবিক তাহার একটাও নয়। ঠিক বুঝিতে পার নাই, ঠিক 'দরিয়াপ্ত' করিতে পার নাই, কেবল সব ভুলে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভুলের খেলায় মূলহারা হইতেছ বই আর কিছুই নহে। যদি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর,–এ'স–পাগলের দলে এ'স, পাগল হ'য়ে দেখ-পাগল কি কয়, শুন। পাগল তোমাদের নীতির বাহিরের জিনিস, তা' বলে ভ্রুকটী দিতে পার, কিন্তু যতদিন ভ্রুকুটী তত দিন ক্রুটী বুঝিলে কৈ ?

হায়! জীব মাতোয়ারা মোহ মদিরায়,
ভুলে আছে নিরবধি সত্য প্রেরণায়।
মায়ামঞ্চে অভিনেতা, স্ত্রী পুত্র ভগিনী মাতা,
যে যেখানে আছে যথা, দেখেও না দেখে তায় ;
যে দিন দেখিতে পাবে– 'তা নয়' ঠিক বুঝিবে,
পাগল হইয়া যাবে মনা পাগলে গায়।